হেতমগড়ের গুপ্তধন / শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



হেতমগড়ের গুপ্তধন

'হেতমগড়ের গুপ্তধন'-এর কোন চরিত্রটির কথা আগে বলব! মাধববাবুর কথা? এটা ঠিক যে, মাধববাবু যদি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে না বেরোতেন, তা হলে কোনও দিনই হয়তো জানা যেত না হেতমগড়ের গুপ্তধন কোথায় রয়েছে লুকনো। আর এটাও ঠিক যে, মাধববাবুর মতো মানুষের তুলনা একমাত্র তাঁর নিজের সঙ্গেই করা চলে। কিন্তু ঘটোৎকচ না থাকলে কি মাধববাবু রাগতেন? ঘটোৎকচ অবশ্য মানুষ নয়, বিশুদ্ধ বাঁদর, কিন্তু বাঁদরামি ছাড়াও বিস্তর কীর্তিকাহিনীর নায়ক সে, একবার ফুটবল খেলার রেজাল্ট যেভাবে পাল্টে দিল, তারপরেও কি শুধুই বাঁদর বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় তাকে? অবশ্য ঘটোৎকচকে ওড়ানো যে অত সহজ নয়, সেটা সব-থেকে ভালো জানত নন্দকিশোর নামের সেই ভূতটা, যে কিনা এই গুপ্তধন আবিষ্কারের আরেক নায়ক। আর যে নাকি কথায়-কথায় ঢুকে যেত মাধববাবুর শরীরে। আর সেই কারণেই না মাধববাবু অমন বিশাল চিতাবাঘটাকে সঙ্গী করে নিতে পারলেন? কী ভাবছ? ভূত কিংবা বাঘ এরা কীভাবে সঙ্গী হল আবার? আরে হয়, হয়। শুধু জানার অপেক্ষা। 'হেতমগড়ের গুপ্তধন' পড়লেই জানতে পারবে ভূত আর বাঘ, চোর আর দারোগা, বাঁদর আর মানুষ সব্বাই মিলে কী মজাদার কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসকে যাকে বলে একেবারে দুর্ধর্ষ স্বাদের করে তুলেছে।

....

ISBN 81-7066-838-7

হেতমগড়ের গুপ্তধন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮১ থেকে **দ্বাদশ মুদ্রণ** ডিসেম্বর ২০০৫ **পর্যন্ত**
মুদ্রণ সংখ্যা ১৮৪০০
ত্রয়োদশ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৮ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০০০

ISBN 81-7066-838-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

৬০.০০

রা-স্বা

রাজাকে

—বাবা

এই লেখকের অন্যান্য বই

অঘোরগঞ্জের ঘোরালো ব্যাপার
কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড
গজাননের কৌটো
গোঁসাই বাগানের ভূত
গৌরের কবচ
চক্রপুরের চক্করে
ছায়াময়
ঝিকরগাছায় ঝঞ্ঝাট
ঝিলের ধারে বাড়ি
ডাকাতের ভাইপো
দশটি কিশোর উপন্যাস
দুধসায়রের দ্বীপ
নবাবগঞ্জের আগন্তুক
নবীগঞ্জের দৈত্য
নৃসিংহ রহস্য
পটাশগড়ের জঙ্গলে
পাগলা সাহেবের কবর
পাতাল ঘর
বক্সার রতন
বনি
বিপিনবাবুর বিপদ
ভুতুড়ে ঘড়ি
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
মোহনরায়ের বাঁশি
রাঘরবাবুর বাড়ি
ষোলো নম্বর ফটিক ঘোষ
সাধুবাবার লাঠি
সোনার মেডেল
হিরের আংটি

মাধববাবু রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তা মাধববাবুর রাগ হলেও হতে পারে। এমনিতেই তিনি রাগী মানুষ। তার ওপর সাতসকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি দেখেন, কাচের গ্লাসে জলে-ভেজানো তাঁর বাঁধানো দাঁতজোড়া নেই, ঘরে পরে বেড়ানোর হাওয়াই চটি দুটো হাওয়া, চশমাটাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী, ঘরের কোণে দড়িতে ঝোলানো গামছাখানা পর্যন্ত বেপাত্তা।

পল্টনের পোষা বাঁদরটা ছাড়া এ-কাজ আর কার হবে? দিনরাত খেয়ে-খেয়ে আর আশকারা পেয়ে-পেয়ে সেটার চেহারা হয়েছে জাম্বুবানের মতো। কাউকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। এর আগেও দু-চারবার তার চুরিবিদ্যে ধরা পড়েছে। একেই জাতে বাঁদর, তার ওপর অতিরিক্ত আদরে বদ হয়ে যাওয়ায় তার বাঁদরামির আর লেখাজোখা নেই। ইচ্ছেমতো ঘরে ঢুকে তার রেডিও চালায়, ছোটদের পড়ার টেবিলে গিয়ে খাতা-বই বেগোছ করে, পেনসিলের শিস ভেঙে রেখে আসে, দিনের বেলায় খুটখাট সুইচ টিপে আলো জ্বালায় বা শীতকালে পাখা চালিয়ে দেয়। চৌবাচ্চা থেকে মগ দিয়ে জল তুলে যার-তার গায়ে ঢেলে দিয়ে আসে। বড়বাবুর ইজিচেয়ারে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বসে থাকে। কেউ শাসন করতে গেলে বিশাল চেহারা নিয়ে হুপহাপ করে তেড়ে আসে। বলতে কী, তার ভয়ে বাড়ির সবাই কাঁটা হয়ে থাকে।

একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্তে মাধববাবু বিছানা ছাড়েন। তারপর

হরেক কাজ করতে হয় তাঁকে। বারান্দার একশো ত্রিশটা টবে গাছে চাকরদের দিয়ে জল দেওয়ানো। পুরনো আমলের বিশাল জমিদার-বাড়ির সেই জৌলুস এখন আর নেই বটে, কিন্তু বিশাল আয়তনটা এখনো আছে। আর কিছু পুরনো প্রথা এবং অভ্যাস। পিছনের দিকে একটা মস্ত হলঘরে হরেক রকম পাখির খাঁচা। মাধববাবুর সকালে দ্বিতীয় কাজ হল, এইসব পাখিদের খাঁচায় ঠিকমতো দানাপানি দেওয়া হচ্ছে কি না তার তদারক করা। তারপরই শুরু হয় চার-চারটে গরুর দুধ দোয়ানো। সে সময়েও তাঁকেই সামনে থাকতে হয়। এরপর বিশাল বাগানের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মালিদের দিয়ে আগাছা উপড়ে ফেলা, ফুলের বেড তৈরি করা, মৌসুমি ফলের চাষ দেখা ইত্যাদি আছে। ভাল করে আলো ফোটার আগেই বাজারের লম্বা ফর্দ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। সঙ্গে ধামাধরা দু-দুটো চাকর। আজ মাধববাবু কিছুই করেননি। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠেই নিজের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলো না-পেয়ে তেড়ে চেঁচামেচি শুরু করলেন। বলি একটা বাঁদরের এত আস্পদ্দা হয় কোত্থেকে? লেজওলাদের বোধহয় লজ্জা-শরমের বালাই নেই? বলি আমার বাঁধানো দাঁত তোর গুষ্টির পিণ্ডি চিবোতে লাগবে রে হতচ্ছাড়া? চশমা দিয়ে কোন রামায়ণ মহাভারত পড়বি শুনি? গলায় দেওয়ার দড়ি জুটছে না বলেই বুঝি গামছাখানা নিয়ে গেছিস? ডান-বাঁ জ্ঞান নেই যে বাঁদরের, সে কোন্ আক্কেলে চটি চুরি করে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই চেঁচামেচি শুনে পল্টন সবার আগে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে এসে হাজির।

"কী হয়েছে কাদামামা?"

মাধববাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "বড় সুখের ব্যাপার ঘটেছে

ডিয়ার ভাগ্নে, বড় সুখের ব্যাপার। এমনিতেই একদিন সংসার ত্যাগ করে লোটা-কম্বল নিয়ে সন্নিসি হব ভেবে রেখেছিলুম, তা তোমার জাম্বুবানের জ্বালায় সেটা একটু আগেভাগেই হতে হবে দেখছি। দাঁতের পাটি নেই, গামছা নেই, চটি নেই, চশমা নেই, তাহলে একটা লোকের আর কী থাকে বলো দিকি! লোটা-কম্বল আর নেংটি ছাড়া?"

পল্টন মুখ কাঁচুমাচু করে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "কিন্তু ঘটোৎকচ তো এখনো শিকলে বাঁধা রয়েছে দেখে এলাম। কাল রাতে তো তাকে আমি খুলে দিইনি।"

মাধববাবু যাত্রাপালার ঔরঙ্গজেবের মতো হাঃ হাঃ করে হাসলেন খুব কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "শিকল? গলার বকলশে একটা সেফটিপিনের মতো ফঙ্গবেনে হাঁসকল দিয়ে আঁটা তো? তা তুমি কি ভাবছ তোমার ঐ হাড়-বজ্জাত মহাবাঁদর সেটা খুলতে বা আটকাতে পারে না? সে কি হাওয়ায় বড় হচ্ছে? সেয়ানা হচ্ছে না?"

পল্টনও সেটা হাড়ে-হাড়ে জানে বলে বিশেষ তর্ক-টর্ক করল না। বাড়ির সবাই যখন ধরেই নিয়েছে যে, দুষ্কর্মটি ঘটোৎকচেরই, তখন সাতজন ঠিকে-ঝিয়ের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কা এবং বকাবাজ হাঁড়ির মা ঘর মুছতে এসে বলল "কাদাবাবুর ঘরের দোর বন্ধ ছিল, জানালায় এত মোটা মোটা শিক, ঐ গন্ধমাদন তবে ঢুকল কোন ফোকর দিয়ে?"

এ কথায় সকলের চোখ খুলে গেল। বাস্তবিক, এই অতি সত্যি কথাটি তো কেউ এতক্ষণ ভাবেনি! ঘটোৎকচ তো আর ছুঁচো ইঁদুর বা বেড়াল নয় যে, জানালা দিয়ে ঢুকবে! বড়বাবু শুনে বললেন, "মাধবের মাথাটাই গেছে।"

মাধববাবুই শুধু এর প্রত্যুত্তরে বলতে লাগলেন, "ফোকর থাক বা না থাক, এ কাজ ঘটোৎকচ ছাড়া আর কারো হতেই পারে না। যেমন করেই হোক সে রাতে ঘরে ঢুকেছিল।"

বড়বাবু শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু ঢুকল কেমন করে সেটা তো বলবে!"

মাধববাবু মরিয়া হয়ে বললেন, "রাতের বেলা আমার তো তেমন ভাল ঘুম হয় না। চারবার উঠি, পায়চারি করি, তামাক বা জল খাই। তারই কোন ফাঁকে ঢুকেছিল।"

কিন্তু মাধববাবুর কথাটা কেউ তেমন বিশ্বাস করল না। এ-বাড়ির বুড়ো দারোয়ান তায়েবজি সাফ-সাফ বলে দিল, "মাধুবাবু কোনোদিন রাতে ওঠেন না। রাতভর তাঁর নাকের ডাকে পাড়ার লোকের অসুবিধে হয়, চোর ডাকু সব তফাত থাকে।"

মাধববাবু এইসব কথায় অল্পস্বল্প রেগে যাচ্ছিলেন। তবে তখনো একদম রেগে টং হয়ে যাননি। তায়েবজির কথার জবাবে বললেন, "আমার ছেলেবেলা থেকেই ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস আছে। এখন আবছা মনে পড়ছে কাল রাতেও আমি খানিকক্ষণ স্লীপ-ওয়াকিং করেছিলাম যেন। দরজা খুলে বারান্দায় এসেও হাঁটাহাঁটি করেছি।"

এসব কথা বলতে বলতে মাধববাবু টের পাচ্ছিলেন যে, তিনি খুবই রেগে যাচ্ছেন। আর কথা চালাচালি হলে এবার তাঁর ভিতরে রাগের বোমাটা ফাটবে। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর মাথার ভিতরে ঠিক ব্রহ্মতালুতে বোমাটা বসানো রয়েছে। বোমার পলতেয় আগুন দেওয়া হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে পুড়তে পুড়তে পলতেটা ছোট হয়ে এসে বোমার গায়ে প্রায় লাগে-লাগে।

ঠিক এই সময়ে অক্ষয় খাজাঞ্চি এসে বলল, "রহিম শেখ পাতুগড়ের আমবাগানটা কিনবে বলে বায়না দিতে এসেছে।"

ব্যস, বোমাটা ফাটল দড়াম করে। সবাইকে চমকে দিয়ে ধমকে ওঠেন মাধববাবু, "ইয়াকি পেয়েছ? মস্করা পেয়েছ সবাই? জানো, মাধব চৌধুরী ভাল থাকলে গঙ্গাজল, আর রাগলে মুচির কুকুর?"

রোগাভোগা অক্ষয় খাজাঞ্চি ভয় পেয়ে তিন হাত পিছিয়ে চৌকাঠের ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। তায়েবজি তার মোটা গোঁফ চোমরাচ্ছিল, আঁতকে ওঠায় একদিকের গোঁফ আঙুলের টানে ঝুলে পড়ে চিনেম্যানের গোঁফ হয়ে গেল। হাঁড়ির মা ঘর মোছার ন্যাতা দিয়ে ভুল করে নিজের মুখ মুছে ফেলল। বড়বাবুর ইজিচেয়ারটা হঠাৎ একটা দোল খেয়ে গেল জোরে। পল্টনের মুখ এমনভাবে হাঁ হয়ে ছিল যে, একটা বোলতা ভুল করে ঢুকে পড়ল তার ভিতরে আর পল্টনও ভুলে কোঁত করে গিলে ফেলল সেটাকে। বাড়ির আরো লোকজন সব দৌড়ে এসে ভিড় করল চারধারে।

মাধববাবু চেঁচাতে লাগলেন, "জানো, আমার দু' দুটো দোনলা বন্দুক আছে! সরস্বতীর চরে গায়েব হওয়া বসতবাটী খুঁজে পেলে এখনো আমি চার-পাঁচলাখ মোহরের মালিক, তা মনে আছে তো? হিসেব করে কথা কও না, এত আস্পদ্দা তোমাদের?"

অক্ষয় খাজাঞ্চি বাইরে থেকে মৃদু স্বরে বলে, "আজ্ঞে কথাটা হচ্ছিল পাতুগড়ের আমবাগানটা নিয়ে। বৃকোদরের কথা বলিনি আজ্ঞে।"

অক্ষয় খাজাঞ্চি বহুদিন ধরেই ঘটোৎকচকে ভুল করে বৃকোদর বলে আসছেন। বহুবার তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু মনে রাখতে পারেন না।

মাধববাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন, "চালাকির আর জায়গা পেলে না! তোমাদের সব চালাকি আমি জানি। এই মুহূর্তেই আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চললাম। যেখানে মানুষ আত্মসম্মান নিয়ে থাকতে পারে না সেখানে থাকার চেয়ে জঙ্গলে থাকা ভাল। আর শোনো অক্ষয়, তোমাকে এই শেষবারের মতো বলে যাচ্ছি, দ্বিতীয় পাণ্ডব বৃকোদরের সঙ্গে কখনো ঘটোৎকচকে গুলিয়ে ফেলো না। তাতে বৃকোদরের অপমান। ঘটোৎকচ তাঁর ছেলে ছিল বটে, কিন্তু তার মা ছিল রাক্ষসী। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচকে স্যাক্রিফাইস করতে কারো বাধেনি। তোমাদের ঐ নোংরা, পাজি, চোর, হাড়-হাভাতে ঘটোৎকচকেও তোমরা স্যাক্রিফাইস করে দাও। তাতে সকলেরই মঙ্গল। নইলে আর একটা কুরুক্ষেত্র লাগল বলে।"

এই শেষ কথা উচ্চারণ করে মাধববাবু তাঁর দুটো পুরনো দোনলা বন্দুকের বাক্স, শতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা আর একটি টিনের তোরঙ্গ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এমনকী, নিজের দিদির সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলেন না।

দেউড়িতে বড়বাবু, পল্টন, অক্ষয় খাজাঞ্চি, তায়েবজি সমেত বাড়ির বহু লোক তাঁর গৃহত্যাগ রোধ করতে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত করার লোক তিনি নন। এর আগে আর না হোক পঞ্চাশবার তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে খুবই দক্ষ বলতে হবে। তাই তাঁকে ফেরানো যাবে না জেনে বড়বাবু একটা মোষের গাড়ির বন্দোবস্ত পর্যন্ত রেখেছেন।

বাইরে বেরিয়ে মাধববাবু তাঁর মালপত্র নিয়ে সোজা গিয়ে গাড়িতে চেপে বসলেন।

সরস্বতী নদীর ধারে লাতনপুরে মাধববাবুর এক থুনথুনে বুড়ি



পিসি থাকেন। তিনি চেনা লোককেও চিনতে পারেন না, চোখে দেখতে পান না, কানেও শোনেন না। সারাদিন আপনমনে বকবক করতে করতে ঘরের হাজারো কাজ করে বেড়ান। তাঁর ছেলেপুলে আর নাতি-নাতনি নিয়ে বিশাল সংসার। মাধববাবু রাগ করে ঘর ছাড়লে এঁর বাড়িতেই এসে ওঠেন। আজও উঠলেন।

মাধববাবু যেখানেই যান, সেখানেই একটা হৈ-চৈ পড়ে যায়। তিনি দারুণ গল্প বলতে পারেন, এঁটেল মাটি দিয়ে চমৎকার পুতুল গড়তে পারেন, গানবাজনা করতে পারেন। তাই তাঁকে দেখেই বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের কিছু দৌড়ে এসে গাড়ির গায়ে ঝুলতে শুরু করল, কেউ কোলেপিঠে চড়ে বসল, আবার একটু বড় যারা তারা দৌড়ে গেল মাধববাবুর পিসিকে খবর দিতে।

বাইরের ঘরে মাধববাবু জমিয়ে বসেছেন। বাচ্চারা তাঁর বন্দুকের বাক্স, তোরঙ্গ আর বিছানা টানা-হ্যাঁচড়া করে খোলবার চেষ্টা করছে। বাড়ির এক বউ এসে বাতাস দিচ্ছে, এক বউ জলের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে, পিসতুতো ভাইয়েরা এসে খোঁজখবর নিচ্ছে। এমন সময় কোলকুঁজো হয়ে ঘরে ঢুকে পিসি তাঁকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "অচেনা লোক ঘরে ঢুকতে দিয়েছিস! চোর-ছ্যাঁচড় নয় তো! দেখিস আবার বাসন-কোসন কাপড়-চোপড় পোঁটলা বেঁধে না শটকান দেয়। এর মুখচোখ দেখে তো ভাল লোক মনে হচ্ছে না।"

কাদা ছেনে পুতুল গড়েন বলেই মাধববাবুর ডাক নাম কাদা। পিসির বড় ছেলে গদাই দৌড়ে গিয়ে মায়ের মুখে হাতচাপা দিয়ে কানে কানে বলে, "অচেনা লোক কী গো! কাদাদাদা যে।"

পিসি তা বুঝল না, তবে এক গাল হেসে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, "তুমিও বুঝি ঐ লোকটার সঙ্গে এলে! দেখো বাপু, চুরি-টুরি

কোরো না। থাকো, ঘরের কাজকর্ম করো, খাবে দাবে মাইনে পাবে।" বলে পিসি চলে গেল।

নেয়ে-খেয়ে ঘুমিয়ে বিকেলের দিকে একটা বন্দুক বগলদাবা করে মাধববাবু নিজেদের হারানো বসতবাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। রাগ হলেই মাধববাবুর এই বাতিকটা মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, মাধববাবুর পিতৃ-পিতামহের অবস্থা ছিল বিরাট। সরস্বতী নদীর ওধারে হেতমগড়ে প্রায় দেড়শো বিঘা জমি ঘিরে ছিল তাঁদের বাড়ির সীমানা। মাঝখানে প্রাসাদের মতো বাড়ি, ফোয়ারা, আস্তাবল, জুড়িগাড়ি, গোলাপ বাগিচা, পদ্মের পুকুর। সরস্বতীর খাত বদল হওয়ায় নদীর ভাঙনে সব ভেসে গেছে। এখন আর সে বাড়ির চিহ্নও নেই। এমনকী, বাড়িটা কোন্ জায়গায় ছিল তারও হদিস কেউ দিতে পারে না। সরস্বতীর ওপারে এখন বিশাল ঘন জঙ্গল, সাপখোপের আড্ডা, বুনো জন্তুর আস্তানা। তবু মাঝে-মাঝে মাধববাবু সেই বাড়িটা খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন।

নদীর এধারে আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে মাধববাবু নিজের রাগের কথা ভাবছিলেন। আর মাঝে-মাঝে নদীর ওধারে ঘন জঙ্গলের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। মধ্যে-মধ্যে হেসেও ফেলছিলেন আপনমনে। জমিদারি রক্তে রাগ থাকাটা এমনিতেই স্বাভাবিক। কিন্তু রহিম শেখের আমবাগান কেনার কথায় হঠাৎ মাথার মধ্যে বেকায়দায় বোমাটা ফেটে যাওয়াতে এখন তাঁর একটু লজ্জা-লজ্জা করছে। কোথায় ঘটোৎকচ, আর কোথায় রহিম শেখ।

মাধববাবুর বাঁধানো দাঁতের কথা শুনে কেউ তাঁকে বুড়ো ভাবলে ভুল হবে। বলতে কী, মাধববাবু রীতিমত যুবক মানুষ। বয়স বত্রিশ-টত্রিশ হবে। বছর পাঁচ-সাত আগে বিজয়পুরের জমিদারের মেয়ের

সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু সে বিয়েটাতেই যত ভণ্ডুল লেগেছিল। বিয়ের পরদিন সকালে শালীরা আদর করে এক থালা নারকেলনাড়ু এনে দিল। বলল, সব কটা খেতে পারলে বুঝব জামাইবাবু আমাদের বাহাদুর। শালীরা জামাইবাবুকে নানা কায়দায় জব্দ করে জেনেও অকুতোভয় মাধববাবু ঠিক করলেন, এদের কাছে হার মানা চলবে না। প্রথম নাড়ুটায় কামড় দিয়েই দেখলেন ভিতরে গোটা সুপুরি রয়েছে। কিন্তু এখন আর ফেরার উপায় নেই। দাঁতের জোর ছিল খুব। তাই খটাস মটাস শব্দে সুপুরিসুদ্ধু সেই নাড়ু চিবোতে লাগলেন। গোটা পাঁচেক খেতে পেরেছিলেন বোধহয়। কিন্তু তা করতে অর্ধেক দাঁতের চলটা উঠে গেল, কিছু নড়ল, কিছু ভাঙল। রাগ করে সেই যে শ্বশুরবাড়ি থেকে একবস্ত্রে চলে এলেন, আর কোনোদিন ওমুখো হননি। দাঁতগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই তুলে বাঁধিয়ে নিতে হল। কিন্তু যুবক হলেও বাঁধানো দাঁতগুলোর অভাবে ফোকলামুখে এখন তাঁকে রীতিমত বুড়ো দেখাচ্ছে। কিন্তু তিনি যে বুড়ো নন সেইটে লোকের কাছে প্রমাণ করার জন্য বুক চিতিয়ে চওড়া ছাতি ফুলিয়ে খুব দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছিলেন তিনি।

তবে তার দরকার ছিল না। নদীর ধারে একটা লোককে বন্দুক হাতে চলাফেরা করতে দেখে লোকজন ভয়ে এমনিতে তফাত থাকছিল।

বড় বাঁধের ধারে হাইস্কুলের মাঠে আজ ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ। দারুণ ভিড় চারদিকে। সেই ভিড়ে ছুঁচ গলবার উপায় নেই। লাতনপুর হাইস্কুলের সঙ্গে হেতমগড় বিদ্যাপীঠের খেলা। খেলা দেখেই মাধববাবুর রক্তটা ঝাঁ করে গরম হয়ে গেল। নিজে তিনি এক সময়ে দুর্দান্ত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু সেজন্য নয়। আসলে

হেতমগড় নামটাই তাঁর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল। সেই হেতমগড় আজ আর নেই। সরস্বতীর বানে পুরনো হেতমগড় ভেসে গিয়ে আবার নতুন করে হেতমগড়ের পত্তন হয়েছে। তবু হেতমগড় নামটাই যথেষ্ট। এই হেতমগড় বিদ্যাপীঠেই তিনি পড়তেন। তাঁর আমলে বিদ্যাপীঠ কখনো হারেনি।

মাধববাবু ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেন এমনই ঠাসা ভিড় যে, লোকগুলোকে যেন আঠা দিয়ে এর-ওর গায়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাধববাবুর ধৈর্য কম। ঝাঁ করে বন্দুকের নলটা ভিড়ের ভিতরে সেঁদিয়ে দিয়ে হুংকার ছাড়লেন, "রাস্তা না দিলে গুলি চালাব কিন্তু।"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই লাতনপুর হেতমগড়কে তিন নম্বর গোলটা দেওয়ায় মাঠে এমন চেঁচামেচি উঠল যে, মাধববাবুর গলার স্বর কারো কানে পৌঁছল না। তবে লোকগুলো উল্লাসের চোটে বেহেড হয়ে নাচতে শুরু করায় মাধববাবুর একটু সুবিধে হয়ে গেল। লোকে যেমন দু হাতে গাছ ফাঁক করে পাটখেতে ঢোকে তিনিও তেমনি নৃত্যরত লোকগুলোকে বন্দুকের কুঁদো আর হাত দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং একেবারে সামনের সারিতে চলে এলেন। মাধববাবু যে বে-আইনিভাবে ঢুকছেন সেটা সামনের সারির লোকেরা কতকটা বুঝলেও তাঁর হাতে বন্দুক দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস পেল না।

তিন গোল খেয়ে হাফটাইমের আগেই হেতমগড় হেদিয়ে পড়েছে। প্লেয়াররা যেন সব কোমরসমান জল ভেঙে হাঁটছে এমন করুণ অবস্থা। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে অন্তত আধ ডজন গোল খাবেই। ভব-তারিণী স্মৃতি শীল্ড বলতে গেলে লাতনপুরের পকেটে। মাধববাবু

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ইশ ইশ! চুকচুক! ছিঃ ছি! রাম রাম! দূর দূর! ঘেন্না ঘেন্না! লজ্জা লজ্জা! করতে লাগলেন।

হেতমগড় হাফটাইমের আগে আর গোল খেল না ভাগ্যক্রমে। তবে বাঁশি বাজতেই হেতমগড়ের সব প্লেয়ার মাঠের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে ঘাসে মুখ লুকোল।

মাধববাবু আর থাকতে পারলেন না। হেতমগড়ের গৌরব-রবি অস্তে যায় দেখে তিনি বন্দুক বগলে চেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠে নেমে পড়লেন। দৃশ্যটা দেখে চারদিকে একটা বিকট চেঁচামেচি উঠল। কিন্তু মাধববাবু গ্রাহ্য করলেন না।

প্লেয়াররা মাঠের ঘাসে শুয়ে দম নিচ্ছে। সকলেরই চোখ বোঝা। খানিক লজ্জায়, খানিক ক্লান্তিতে। তাদের গেম-স্যার প্রিয়ংবদবাবু পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মতো পায়চারি করতে করতে গাধা, উল্লুক, বেতো ঘোড়া, ম্যালেরিয়া রুগি, বার্লিখোর এই সব বলে বকাবকি করছেন। এই সময়ে মাধববাবু গিয়ে প্রিয়ংবদবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বললেন, "আমাকে চিনতে পারছ প্রিয়?"

প্রিয়ংবদ চিনতে পারলেন, এক সময়ে হেতমগড় বিদ্যাপীঠে একসঙ্গে পড়তেন। প্রিয়ংবদ ছিলেন লেফট-আউট আর মাধব ছিলেন রাইট-আউট। ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রিয়ংবদ বললেন, "তুমি! তা কী খবর? মুখখানা ফোকলা কেন? হাতে বন্দুক কেন?"

মাধবের মাথায় আবার একটা রাগের বোমা ফাটবার জন্য অপেক্ষা করছে। পলতের আগুন বোমার গায়ে লাগে লাগে। তবু যথাসাধ্য অমায়িক হেসে মাধব বললেন, "বন্দুক দেখে ভয় পেলে নাকি প্রিয়? ছ্যাঃ ছ্যাঃ। তোমাকে যে বেশ সাহসী লোক বলে জানতাম।"

তা, বলতে নেই, প্রিয়ংবদ একটু ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই। মাধবের ধাত তিনি ভালই জানেন। মাধবের ঠাকুর্দা রাগ হলে বন্দুক পিস্তল তরোয়াল তো বের করতেনই, তার ওপর আবার নিজের মাথার চুল দু হাতে টেনে ছিঁড়তেন। তাই অল্প বয়সেই মাথায় টাক পড়ে গেল। বলতে কী, সেই রাগ আর টাকই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টাক পড়ার পর একবার রেগে গিয়ে যখন মাথার চুল ছিঁড়তে গিয়ে দেখলেন যে, চুল আর একটাও অবশিষ্ট নেই তখন নিজের টাকের ওপর রেগে গিয়ে দমাস দমাস করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে খুলিটাই ফেটে গেল। মাধবের বাবা ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক। তা বলে রাগ তাঁরও কম ছিল না। রেগে গিয়ে পাছে মানুষ খুন করে বসেন সেই ভয়ে প্রায় সময়েই তিনি রেগে গেলে খুব লম্বা কোনো নারকোল বা তাল গাছে উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। কিন্তু এত ঘন ঘন তাঁর রাগ হত যে, একটা জীবন তাঁর প্রায় গাছের ওপর বসে থেকেই কেটে গেছে। সেই রক্তই মাধবের ধমনীতে বইছে। সুতরাং ভয়েরই কথা। তাই প্রিয়ংবদ কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "সারা বছর ধরে এত করে খেলা শেখালাম, কিন্তু ছেলেগুলো একেবারে শেষ সময়টায় ভরাডুবি ঘটাবে কে জানত?"

মাধব খুব মিষ্টি করে বললেন, "সে তো ঠিকই, কিন্তু তা-বলে হেতমগড়ের ইজ্জত তো ভেসে যেতে পারে না। হেতমগড় জায়গাটা ভেসে যেতে পারে, কিন্তু ইজ্জত নয়।" এই বলে মাধব হঠাৎ বিকট হুংকার ছেড়ে বললেন, "বুঝলে?"

প্রিয়ংবদ চমকে তিন হাত শূন্যে উঠে আবার পড়লেন। হেতমগড়ের খেলোয়াড়রা শোয়া অবস্থা থেকে ভিরমি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

মাধববাবু নিজের ব্যক্তিত্বের জোর এবং তেজ দেখে একটু খুশিই হলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং প্রাইজ দিতে মাঠে এসেছেন। সুতরাং প্রচুর পুলিস আর পাহারার ব্যবস্থাও মাঠে ছিল। মাধববাবুকে বন্দুক হাতে মাঠে নেমে গুণ্ডামি করতে দেখে সেই সব পুলিস চারদিক থেকে খুব সতর্কভাবে ঘিরে ধরে ক্রমে বৃত্তটা ছোট করে আনছিল। মাধববাবু রাগের মাথায় অতটা লক্ষ করেননি। হঠাৎ তিন-চারটে মুশকো জোয়ান তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ে হাত-পা ধরে ফেলায় তিনি ভারী হতভম্ব হয়ে গেলেন। বললেন, "এ কী!"

পুলিস ইনস্পেকটর এগিয়ে এসে বললেন, "প্রকাশ্য জায়গায় ফায়ার আর্মস নিয়ে গুণ্ডামি করার জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।"

মাধববাবুর মাথার মধ্যে বোমার পলতের আগুনটা হঠাৎ নিভে গেল। বলতে নেই, দুনিয়ায় একমাত্র পুলিসকেই তাঁর যত ভয়। মাথা নিচু করে পুলিসে ঘেরাও মাধববাবু মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন।

২

মাঠের দক্ষিণ কোণ থেকে পুরো ব্যাপারটাই পল্টন আর ঘটোৎকচ লক্ষ করছিল। ঘটোৎকচের মেজাজ ভালই আছে। গোটা দশেক কলা আর গোটা ত্রিশেক জামরুল খাওয়ার পর সে এখন পোয়াটাক বাদামভাজা নিয়ে খুব ব্যস্ত। বাদামভাজা পল্টনের জামার পকেটে। সুতরাং ঘটোৎকচকে সেটা চুরি করে খেতে হচ্ছে। কিন্তু মাঠে মাধববাবুর পরিণতি দেখে পল্টন এমন হাঁ হয়ে গেছে যে, পকেটমারের ঘটনাটা টেরই পায়নি। হঠাৎ সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, "কাদামামাকে ধরে নিয়ে গেল যে রে ঘটোৎ!"

হেতমগড় যে কাদামামার কত গর্বের বস্তু সেটা সবাই জানে। হেতমগড় হেরে যাচ্ছিল বলেই উনি মাঠে নেমে হম্বিতম্বি করছিলেন বটে, কিন্তু সেটা যে কাউকে খুন করার জন্য নয় এ তো বাচ্চাদেরও বোঝাবার কথা। তবে কিনা মাধববাবুকে চেনেই বা ক'জন? না-চিনলে লোকে বুঝবেও না।

রেফারী বাঁশি বাজাচ্ছে, খেলা আবার শুরু হল বলে, পল্টন নিঃশব্দে ঘটোৎকচের গলার বকলশ থেকে শিকলের আংটা খুলে নিয়ে কানে-কানে কী যেন শিখিয়ে দিল।

এদিকে সেণ্টার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই লাতনপুরের ফরোয়ার্ডরা বল ধরে ব্যাঘ্র-বিক্রমে হেতমগড়ের গোলে হানা দিল।



রাইট-উইং থেকে বল চমৎকারভাবে ব্যাক সেণ্টার হয়েছে। রাইট-ইন বল ধরেই থ্রু করে বলটা এগিয়ে দিল। একেবারে রসগোল্লার মতো সহজ বল। পা ছোঁয়ালেই গোল। তা পা প্রায় ছুঁইয়ে ফেলেওছিল লাতনপুরের লেফট-ইন। কিন্তু মুশকিল হল, বলটার নাগাল না পেয়ে। দিব্যি সুন্দর বলটা একটু ধীরগতিতে গড়িয়ে যাচ্ছিল সামনে, লেফট-ইন ছুটে গিয়ে পজিশন নিয়ে শট করতে পা'ও তুলেছে, ঠিক এই সময়ে একটা অতিকায় বানর কোত্থেকে এসে বলটাকে কোলে তুলে এক লাফে গোলপোস্টের ওপরে উঠে গেল। তারপর লেফট-ইনকে মুখ ভেংচে বলটা মাঠের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরতর করে নেমে পালিয়ে গেল।

মাঠে কেউ কেউ প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। কেউ রাগে গরগর করতে লাগল। কেউ বলল, 'ধর ওটাকে, ধর।' রেফারী বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে জড়ো করে বললেন, "এটা একটা ন্যাচারাল ডিসটারবেনস। সুতরাং ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু হোক।"

লাতনপুর গোল দিতে না পেরে হতাশ, হেতমগড় চতুর্থ গোলের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ায় বেশ চাঙ্গা। ফলে ড্রপ দেওয়ার পর হেতমগড়ের খেলোয়াড়রা প্রাণপণ চেষ্টায় লাতনপুরের সীমানার মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে পড়ল।

অবশ্য গোল হওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তবু হেতমগড়ের রাইট-উইং মরিয়া হয়ে লাতনপুরের গোলে একটা অত্যন্ত দুর্বল শট নিয়েছিল। শট এতই দুর্বল যে গোলের দিকে যাওয়ার আগে দুবার মাটিতে ড্রপ খেল। লাতনপুরের ব্যাকরা ভাবল, গোল-কীপারই বলটা ধরুক। তাই নিজেরা আর গা ঘামাল না। গোলকীপার নিশ্চিতমনে বলটা ধরার জন্য এগিয়েও এসেছিল।

এই সময়ে হঠাৎ গোলপোস্টের মাথা থেকে ঘটোৎকচ বিকট একটা 'হুপ' দিল, তারপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড অঙ্গভঙ্গি করে নাচ জুড়ে দিল। সেই সঙ্গে 'কুক-কুক' করে বাঁদুরে গান।

গোলকীপার একটা বাচ্চা দুধের ছেলে। বাঁদরের এই বীভৎস নাচ-গান দেখে সে এমনই ঘাবড়ে গেল যে, বলটার কথা তার মনেই রইল না। বলটা তার সামনেই ড্রপ খেয়ে তার হাত ছুঁয়ে প্রায় বগলের তলা দিয়ে খুব অনিচ্ছের সঙ্গে গোলে গিয়ে ঢুকে গেল।

রেফারী গোলের বাঁশি বাজালেন। লাতনপুর প্রতিবাদ জানালে রেফারী বললেন, "বাঁদরটা চেঁচিয়েছে বটে, নাচও দেখিয়েছে, কিন্তু সে তো দর্শকরাও হামেশাই দেখায়। সুতরাং ওতে আইনভঙ্গ হয় না।"

সুতরাং হাফটাইমের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফল দাঁড়াল ৩—১। মাঠে এমন হইচই পড়ে গেল যে কান পাতা দায়।

গোল খেয়ে যেমন একটু বোম্‌কে গেল লাতনপুর, গোল দিয়ে তেমনি চুমকে উঠল হেতমগড়। সুতরাং খেলাটা আর এক তরফা রইল না। লাতনপুরের বিখ্যাত হাফব্যাক ফটিক বল ধরে হরিণের মতো দৌড়ে লেফট-ইনকে বল বাড়াল একবার। লেফট-ইন নিখুঁত একটা ভলি গোলে মেরে দিল। হেতমগড়ের গোলকীপার মাটিতে পড়ে আছে, বল জালে ঢুকছে, ঠিক এই সময়ে আবার বাঁদুরে কাণ্ড। ঘটোৎকচ ঝুপ করে যেন আকাশ থেকে দৈব বাঁদরের মতো নামল এবং বলটা পট করে ধরে আবার গোলপোস্টে উঠে গেল। লাতনপুর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গোলের দাবি করতে লাগল। কিন্তু রেফারী কঠিন স্বরে বললেন, গোলে বল না ঢুকলে গোল

দেওয়ার কোনো আইন নেই। সুতরাং আবার ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু হল। হেতমগড়ের খেলুড়েরা দারুণ উৎসাহের চোটে বল লেনদেন করতে করতে ঢুকে পড়ল লাতনপুরের এলাকায়। লাতনপুরের গোলকীপার থেকে শুরু করে সব খেলুড়েই বাঁদরাতঙ্কে কণ্টকিত। তারা এই সময়ে বাঁদরের হস্তক্ষেপ আশঙ্কা করে চারদিক চাইছে, সকলেরই দোনো-মোনো ভাব, বাঁদরটা কখন কোন দিক থেকে হানা দেয়। আর এই দোনো-মোনোর ফলেই হেতমগড়ের রাইট লিংকম্যান ষষ্ঠীচরণ মনের সুখে একখানা ফাঁকা জমি ধরে এগিয়ে গিয়ে গুপ করে জোরালো শটে গোল দিয়ে দিল। ফল ৩—২।

সেকেণ্ড হাফের পনেরো মিনিটের মধ্যেই খেলার হাওয়া উল্টো দিকে বইতে থাকে। হেতমগড় বুঝতে পেরেছে স্বয়ং সৌভাগ্যই আজ বাঁদরের রূপ ধরে এসে তাদের পক্ষ নিয়েছে। আর লাতনপুর ভুগছে বাঁদরের আতঙ্কে। সুতরাং দ্বিতীয় গোলটার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ষষ্ঠীচরণ আবার এগোল এবং বল পাস করল রাইট-উইংকে। রাইট-উইং বল ধরে ধনুকের মতো বাঁকা পথে ছুটতে লাগল হরিণের মতো। ওদিকে গোলপোস্টের মাথায় ঘটোৎকচ উঠে বসে আছে এবং গোলকীপারের নাকের ডগায় নিজের লম্বা লেজটা নামিয়ে দিয়ে খণ্ড ত দেখাচ্ছে। লাতনপুরের গেম-স্যার জয়পতাকাবাবু একটা পোলভল্টের বাঁশ নিয়ে বাঁদরটাকে তাড়া করতে দৌড়োচ্ছেন। রাগী ও রাশভারী জয়পতাকা-স্যারকে বাঁশ নিয়ে দৌড়োতে দেখে লাতনপুরের খেলোয়াড়রা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ফাঁকে রাইট-উইং খুব সহজেই গোলে বল ঢুকিয়ে ফল ৩—৩ দাঁড় করিয়ে দিল। রেফারী বাঁশি বাজানোর পর লাতনপুরের খেলোয়াড়রা অবাক হয়ে দেখল, তারা আর-একটা গোল খেয়ে গেছে।

জয়পতাকা-স্যার অবশ্য ঘটোৎকচকে বাঁশপেটা করতে ব্যর্থ হলেন। কারণ ঘটোৎকচ হঠাৎ একটা ডিগবাজি খেয়ে নেমে জয়-পতাকাবাবুর ধুতির কাছা এক টানে খুলে ফেলে হাতের বাঁশটা কেড়ে নিয়ে দৌড়। চারদিকে প্রচণ্ড চেঁচামেচি, হাসাহাসি পড়ে যাওয়ায় রাশভারী ও রাগী জয়পতাকা-স্যার নিজের কাছা আঁটতে-আঁটতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ডিসিপ্লিন ! ডিসিপ্লিন !"

খেলা আবার শুরু হল বটে, কিন্তু লাতনপুরের ততক্ষণে সব উৎসাহ নিভে গেছে, দমও ফুরিয়ে এসেছে। খেলায় তারা মনোযোগই দিতে পারল না। সুতরাং ঘটোৎকচ আর হানা না দেওয়া সত্ত্বেও হেতমগড় গুনে গুনে আরো দুটো গোল দিল লাতনপুরকে।

হেতমগড়ের ক্যাপটেনের হাতে ভবতারিণী স্মৃতি শীল্ড তুলে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, "পশুপাখি যে মানুষের কত উপকারে লাগে, তা বলে শেষ করা যায় না। পশুপাখির কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।" এর পর লাতনপুরের ক্যাপটেনের হাতে রানার্স আপের পুরস্কার তুলে দিয়ে তিনি বললেন, "কিছু কিছু পশুপাখি যে মানুষের কত অপকার সাধন করে তার হিসেব নেই। এইসব অপকারী পশুপাখির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করাটা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে নিতে হবে।"

দুরকম কথাতেই দর্শক ও শ্রোতারা খুব হাততালি দিল।

ওদিকে থানার লক-আপে চারটে চোরের সঙ্গে এক কুঠুরিতে আবদ্ধ মাধববাবু এতসব খবর জানেন না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন আর হেতমগড়ের হেরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। বিকেলে চা খাওয়ার অভ্যাস, কিন্তু লক-আপে চা জোটেনি বলে মাথাটা টিপটিপ করছে। বাঁধানো দাঁত, গামছা ও চটির শোকও

উথলে উঠছে বুকের মধ্যে। সেই সঙ্গে পৈতৃক মোহরের কথা ভেবেও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন।

এমন সময়ে চারজন চোরের মধ্যে একজন একটু সাহস করে বলল, "হেতমগড়ের কুমার-বাহাদুর না?"

মাধববাবু চোখ খুললেন। এতক্ষণ লজ্জায় তিনি এই চারটে লোকের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখেননি। এখন দেখলেন, চার-জনের মধ্যে যে লোকটা সবচেয়ে বুড়ো সেই পাকা চুল আর পাকা দাড়িওলা লোকটা জুলজুল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। মাধববাবু খানিকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে ম্লান একটু হেসে বলেন, "তুমি বনমালী! তাই বলো।"

বনমালী ছিল হেতমগড়ে মাধবদের বাড়ির মালি। দারুণ সুন্দর সব ফুল ফোটাতে আর ফল ফলাতে তার জুড়ি ছিল না। তবে যাকে বলে ক্লিপটোম্যানিয়াক, বনমালী ছিল তাই। চুরি করা ছিল তার মজ্জাগত কু-অভ্যাস। চুরি করতে না পারলে তার পেট ফাঁপত, আইঢাই হত, রাতে ঘুমোতে পারত না ভাল করে। সোনাদানাই হোক বা সেফটিপিন, নস্যির কৌটো, কাচের চুড়ি যাই হোক, কিছু-না-কিছু তাকে চুরি করতেই হবে। চুরি করে বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কেবল জিনিসগুলি নিয়ে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে দিত। তাই বনমালীর চুরিবিদ্যের জন্য তাকে কেউ খারাপ চোখে দেখত না। এমনকী, যাতে সে চুরির অভ্যাস বজায় রাখতে পারে তার জন্য বাড়ির এখানে-সেখানে জিনিসপত্র ফেলে রাখা হত। তারপর তার ঘর থেকে একসময়ে গোপনে সেগুলি উদ্ধার করেও আনা হত।

বনমালী অবাক হয়ে বলে, "আপনাকে কয়েদ করেছে এতবড়

সাহস পুলিসের হয় কী করে ?”

মাধব ম্লান মুখে বলেন, “সে অনেক কথা। সে সব না তোলাই ভাল। তুমি কেমন আছ বলো !”

বনমালী দুঃখ করে বলল, “হেতমগড় ভেসে যাওয়ার পর আর কাজকর্ম জোটেনি। চেয়েচিন্তে দিন কাটে। গাছপালা ছাড়া থাকতে পারি না বলে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। আর কিছু লোক চুরিবিদ্যে শিখতে আমার কাছে আসে, তাদের শেখাই। কিন্তু আজকালকার ছ্যাঁচড়াগুলো এত লোভী যে, বিদ্যেটা ভাল করে না-শিখেই হামলে চুরি করতে যায় আর ধরা পড়ে বে-ইজ্জত হয়। এই দেখুন না, এই তিনটে স্যাঙাতকে বিদ্যেটা সবে শেখাতে শুরু করেছিলাম, তা বাবুদের তর সইল না। ভাল করে না-শিখেই থানার পুকুর থেকে মাছ চুরি করতে গিয়ে ধরা-টরা পড়ে একশা। নিজেরা তো ধরা পড়লই, আবার পিঠ বাঁচাতে আমার নামও পুলিসকে বলে দিল। তাই কপালের ফেরে জেলখানায় বসে আছি। কিন্তু ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। হাজতে আটক না থাকলে আপনার সঙ্গে দেখাই হত না।”

মাধব বনমালীকে বহুকাল বাদে দেখে খুশি হলেন। এক সময়ে বনমালীর কোলেপিঠে চড়েই মানুষ হয়েছেন। বললেন, “কথাটা খুব খাঁটি। তবে কিনা হাজতে আসা বা থাকাটা আমার তেমন পছন্দ নয় হে, বনমালী।”

বনমালী এক গাল হেসে বলল, “আপনাকে বেশিক্ষণ হাজতে থাকতে হবে না, কর্তা। সে-ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।”

তারপর এক রোগা-পাতলা চেহারার স্যাঙাতের দিকে চেয়ে বনমালী হুকুম দিল, “বিষ্টু, ওঠ।”

বিষ্টুকে এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেননি মাধব। এবার করলেন এবং একটু অবাক হয়ে গেলেন। বিষ্টুর হাবভাবের মধ্যে বেশ একটা বাঁদুরে ভাবভঙ্গি আছে। দাঁড়ানোর সময় একটু কুঁজো হয়ে থাকে, লম্বা রোগা হাত দুখানা সামনের দিকে ঝুল খায়। মাঝে-মাঝে বাঁদরের মতো গা-চুলকানোর স্বভাবও তার আছে। হুকুম পেয়ে সে হাজতঘরের একটা কোণে গিয়ে সমকোণ দুই দেয়ালের খাঁজে দাঁড়াল। তারপর গুরু বনমালীর দিকে ফিরে একটা নমস্কার জানিয়ে দুদিকের দেয়ালে হাত আর পা চেপে টিকটিকির মতো ওপরে উঠে যেতে লাগল। দৃশ্যটা দেখে মাধব হাঁ। ঘটোৎকচেরও যে এমন এলেম নেই!

অনেক ওপরে, ছাদের কাছ বরাবর একটা গরাদ লাগানো ঘুলঘুলি আছে। তা দিয়ে বাইরে সদর রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়। বিষ্টু ওপরে উঠে সেই ঘুলঘুলি দিয়ে ভাল করে বাইরেটা দেখে নিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল। নাক বাড়িয়ে বাতাসটা বোধহয় শুঁকলও একটু। বনমালী মাধবের দিকে চেয়ে বলল, "এ তেমন কোনো কেরদানি নয়, কর্তা। এ হল টিকটিকি বিদ্যা। ওস্তাদের ওপর ভক্তি আর বিদ্যে শেখার 'হাউস' থাকলে এসব শেখা তেমন কোনো শক্ত কাজ নয়।"

মাধব জবাব দিতে পারলেন না। বিষ্টু খানিকক্ষণ ওপরে থেকে আবার নেমে এল। বলল, "সিপাইরা বেশি নেই। রাস্তাঘাট খুব থমথম করছে। তার মানে আজকের খেলায় লাতনপুর জিততে পারেনি। আর-একটা খুব অবাক কাণ্ড দেখলাম। ঘুলঘুলির ওপাশে একটা কাঁঠাল গাছের ডালে মস্ত একটা বানর বসে আছে, তার কোলে একটা ফুটবল। আমাকে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পেয়ে

হুপ হুপ করে কী যেন বলল। ভাষাটা ঠিক বুঝলাম না।"

মাধব হেসে বললেন, "জাতভাই বলে বাঁদরটা তোমাকে চিনতে পেরেছে যে! চেষ্টা করলে ভাষাটা আয়ত্ত করা তেমন শক্ত হবে না তোমার। বাঁদরের আর সব কিছু শিখতে তো বাকি রাখোনি বাপু, ভাষাটা আর কত কঠিন হবে? বলতে-বলতেই মাধববাবুর কী একটা খেয়াল হয়। তিনি একটু থেমে চেঁচিয়ে ওঠেন, "বাঁদরটা কি খুব বড়?"

"বড়ই।" বিষ্টু জবাব দেয়।

ঘটোৎ নয় তো? মাধববাবু চিন্তিত মুখে আপনমনে বলতে লাগলেন, "কোলে ফুটবল দেখলে? ব্যাপারটা খুব ঘোরালো ঠেকছে তো! শহরটাই বা থমথম করবে কেন? লাতনপুর হাফটাইমের আগেই তিন গোল দিয়েছে দেখে এসেছি। হাফটাইমের পর আরো তিনটে দেওয়া তাদের কাছে শক্ত নয় মোটেই।"

ঠিক এই সময়ে রাস্তা দিয়ে বিরাট শোরগোল তুলে একটা মিছিল এল। "...ভবতারিণী স্মৃতি শীল্ড জিতল কে? হেতমগড় আবার কে? ...হেরে হয়রান হল কে? লাতনপুর, আবার কে?..."

বিড়বিড় করে মাধববাবু বললেন, "আশ্চর্য! পরমাশ্চর্য! পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য!"

বনমালী তার স্যাঙাতদের নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে ফিসফিস করে কী পরামর্শ দিচ্ছিল। মাধব মাথায় হাত দিয়ে বসে হাজারো কথা ভাবছিলেন। ভবতারিণী স্মৃতি শীল্ড। বাঁধানো দাঁত। হেতমগড়ের হারানো মোহর। ঘটোৎকচের কোলে ফুটবল। ভাবতে-ভাবতে মাথা ঝিমঝিম করায় একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলেন।

হঠাৎ লোহার গেট খুলবার শব্দ হল। ঘরে এসে দাঁড়ালেন

থানার নতুন দারোগা নবতারণ ঘোষ। ছ ফুট লম্বা বিভীষণ চেহারা, দুটো চোখ আলুর মতো গোল আর টর্চবাতির মতো জ্বলজ্বলে, হাত দুটো দেখলে মনে হবে ঐ দুই হাতে একটা মোষের মাথা তার ধড় থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। দারোগা হিসেবে নবতারণের সাঙ্ঘাতিক নামডাক।

নবতারণ মাধবের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার অপরাধ খুবই গুরুতর। পাবলিক প্লেসে আপনি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছেন। সুতরাং কঠিন শাস্তির জন্য তৈরি হোন।"

মাধববাবু বরাবরই পুলিসের ভয়ে আধমরা। দুনিয়ায় আর কোনো-কিছুকে গ্রাহ্য না করলেও কেবল এই পুলিসই তাঁকে কাবু করে রেখেছে। পুলিস দেখলে তাঁর রাতে ঘুম হয় না, খাওয়া কমে যায়, পেটের মধ্যে অনবরত গুড়গুড় করতে থাকে। এখনো করছিল। তাই তিনি ভ্যাবাচ্যাকা মুখে নবতারণের দিকে চেয়ে ছিলেন।

নবতারণ বনমালীর দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার হিস্টরিও আমি সব জানি। এ-অঞ্চলের যত চোর ডাকাত আর বদমাশ সব তোমার কাছে ট্রেনিং নেয়। ট্রেনার হিসেবে তুমি খুবই উঁচুদরের সন্দেহ নেই। কিন্তু আমিও অতি উঁচুদরের দারোগা, এটা ভুলে যেও না। তুমি হাজত থেকে ইচ্ছে করলেই পালাতে পারো, তাও আমি জানি। সেইজন্য আমি বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছি। সদর থেকে চারটে বাঘা কুকুর আনা হয়েছে, তারা দিনরাত থানা পাহারা দেবে। ভাল ট্রেনিং পাওয়া দু ডজন স্পেশাল সেপাইও আনা হয়েছে তোমাদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার জন্য। তাছাড়া আমি তো আছিই। লোকে বলে, আমার নাকি দশ জোড়া চোখ, দশটা হাত আর দশটা মগজ। কাজেই খুব সাবধান!"

এই বলে নবতারণ চলে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বনমালী কাচুমাচু মুখ করে বলল, "কর্তা, ব্যাপারটা খুব সুবিধের ঠেকছে না। কাল অবধি নবতারণ এ-থানায় ছিল না। আজই বদলি হয়ে এসে কাজ হাতে নিয়েছে। ওর মতো ঘুঘু লোক আর নেই।"

মাধব নেতিয়ে বসে ছিলেন। বললেন, "তাহলে কী হবে?"

"এখন তো চুপচাপ থাকুন। দেখা যাক।"

বাইরে এমন সময় গোটা চারেক কুকুরের গম্ভীর গর্জন শোনা গেল। হাঁকডাকেই বোঝা যায়, এরা যেমন-তেমন কুকুর নয়। সেলের সামনে দিয়ে কয়েকজন বিকটাকার লোক ঘোরাফেরা করে গেল। তাদের ছুরির মতো ধারালো চোখ, মুখ খুব গম্ভীর। দেখে-শুনে মাধব আরো ঘাবড়ে গেলেন।



এদিকে পল্টন পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। ফুটবলের মাঠে যখন প্রাইজ ডিসট্রিবিউশন চলছিল তখনই ঘটোৎকচ এক ফাঁকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। লাতনপুরের গেম-স্যার জয়পতাকাবাবু একটা ফুটবল হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘটোৎকচ স্রুট করে বলটা হাতিয়ে নিয়েই দৌড়।

তাতে পল্টন খুশিই হয়েছিল। ফালতু একটা ফুটবল পেয়ে যাওয়ায় তার তরুণ সঙ্ঘের বেশ সুবিধেই হবে। কিন্তু মুশকিল হল ঘটোৎকচ কিছুতেই বলটা হাতছাড়া করতে নারাজ। মদনমোহন-বাড়ির আমবাগানে ঢুকে দুজনে যখন গা-ঢাকা দিয়েছিল, তখন পল্টন অনেক তোতাই-পাতাই করেছে। কিন্তু নতুন জিনিস হাতে পেয়ে ঘটোৎকচ তাকে বেশি পাত্তা দিতে চায়নি।

যাই হোক, কাদামামাকে থানায় নিয়ে গেছে, সুতরাং ফুটবল নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পল্টনের তখন নেই। সুতরাং সে ফুটবল-সহই ঘটোৎকচকে নিয়ে আঁশফলের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে থানামুখো রওনা দিল।

কাদামামাকে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে কী ভাবে রেখেছে সেটা জানা দরকার। তাই সে ঘটোৎকচকে যতদূর সম্ভব আকারে ইঙ্গিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছেড়ে দিল। ফুটবল বগলে নিয়েই ঘটোৎকচ থানার

কাছ-বরাবর একটা কদম গাছে উঠে একটা ডাল ধরে ঝুল খেয়ে মস্ত উঁচু দেওয়ালের ওপর নামল। তারপর সেখান থেকে এক লাফে উঠল একটা কাঁঠাল গাছে। সেখানে ফুটবল কোলে করে বসে রইল আপন মনে। কোথায় কাদামামার খবর নেবে তা নয়, কেবল কোলের ফুটবলটা ছুঁড়ে দিয়ে ধরে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, শোঁকে।

পল্টন অনেক শিস-টিস দিয়ে ইশারা করল। কোনো কাজ হল না তাতে। এদিকে সন্ধে হয়ে এসেছে। দিনের আলো থাকতে-থাকতে বাড়িতে না ঢুকলে বাবা আস্ত রাখবেন না। বাড়ির নিয়ম-কানুন ভারী কঠিন।

পল্টন বাইরে থেকেই দেখল, থানার পুলিসের গাড়ি থেকে চার-চারটে ভীষণ চেহারার কুকুর নামানো হল, অনেক নতুন সেপাইও এল আর-একটা গাড়িতে।

খুব ভয়ে-ভয়ে পল্টন গিয়ে থানার ফটকে এক পাহারাওলাকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে দারোগাসাহেব?"

পাহারাওলা দারোগাসাহেব সম্বোধনে খুশি হয়ে বলল, "বহু বড়া বড়া চারঠো খুনী ডাকু পকার গয়া।"

কাদামামার জন্য দুশ্চিন্তা আর ঘটোৎকচের মুণ্ডুপাত করতে করতে পল্টন বাড়ি ফিরে গেল।

মাধব পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন শুনে বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেল।

অক্ষয় খাজাঞ্চী বলল, "আমি আগেই জানতাম, মাধববাবু একজন ছদ্মবেশী দাগি আসামি। এ-বাড়ির কুটুম সেজে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।"

তায়েবজি একবার মিলিটারিতে ঢুকতে গিয়েছিল। কিন্তু পারেনি।

মিলিটারির ওপর তার দারুণ শ্রদ্ধা। হরবখত তারা বন্দুক-কামান চালায়। কিন্তু এ-বাড়ির লোক তায়েবজিকে একটা বন্দুকও দেয়নি। বন্দুক ছাড়া দারোয়ানের কোনো ইজ্জত থাকে? তায়েবজি গোঁফ চুমরে বলে, "ও বাত ঠিক নেহি। আসলে মাধববাবু মিলিটারির আদমি। ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, তাই ধরা পড়ে গেছেন। মিলিটারি ছাড়া আর কেউ দু' দুটো বন্দুক রাখে?"

হাঁড়ির মা অবশ্য ঠোঁট উল্টে বলল, "ও মামলা টিঁকবে না। বন্দুকে গুলিই ছিল না যে!"

পল্টনের মা খবর শুনে কাঁদতে বসলেন। বড়বাবু বারান্দায় দ্রুত পায়ে পায়চারি করতে লাগলেন।

এ-বাড়ির লোককে পুলিসে ধরেছে জেনে পল্টনের বাড়ির মাস্টার-মশাই পড়াতে এসে এমন ভয় খেয়ে গেলেন যে, একা বাড়িতে ফিরতে সাহস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত বাড়ির এক চাকর হ্যারিকেন ধরে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এল! অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ির লোকের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। কেবল নানারকম শলাপরামর্শ চলতে লাগল। পাড়া-প্রতিবেশীরাও দলে দলে এসে ভিড় জমাল।

পল্টন গিয়ে ঘন ঘন দেখে আসছে ঘটোৎকচ ফিরে এসেছে কি-না। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্তও তার টিকির হদিশ পাওয়া গেল না।

ঘটোৎকচের অবশ্য ফেরার উপায়ও ছিল না।

হল কী, ঘটোৎকচ তো ফুটবল কোলে নিয়ে মহা উৎসাহে গাছের ডালে বসে বসে লেজ দোলাচ্ছে। এদিকে চারটে বিভীষণ কুকুর থানায় ঢুকে ছাড়া পেয়েই বনবন করে চারদিকটা দেখে নিয়েছে। হঠাৎ চারজনই কাঁঠাল গাছের তলায় জড়ো হয়ে ঊর্ধ্বমুখে প্রবল



'ঘ্যাও ঘ্যাও' আওয়াজ করে চেঁচাতে থাকে।

সেই চিৎকারে থানার যত সেপাই সেখানে এসে জুটল। ব্যাপারটা অদ্ভুত। গাছের ডালে একটা মস্ত বাঁদর বসে আছে, তার কোলে একটা ফুটবল।

জয়পতাকাবাবুর হাত থেকে বল ছিনতাই হওয়ার ঘটনা পুলিস জানে। সেই হারানো বল এত সহজে ফেরত পাওয়া যাবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। এখন কাজ হল, বাঁদরের হাত থেকে বলটা উদ্ধার করা।

নবতারণবাবু শুনেছিলেন, বিলেতে এক টুপিওলা টুপি পাশে রেখে গাছতলায় ঘুমোবার সময় গাছের বাঁদররা তার সব টুপি নিয়ে গাছে উঠে যায়। টুপিওলা ঘুম থেকে উঠে দেখে, বাঁদররা তার সব টুপি মাথায় পরে গাছের ডালে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে। কিছুতেই সেই টুপি বাঁদরদের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পেরে টুপিওলা রাগ করে নিজের মাথার টুপি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমনি বাঁদররাও যে যার মাথার টুপি খুলে ঝুপঝাপ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নবতারণবাবু সেই কৌশলটা খাটালেন। হাতের কাছে বল ছিল না। তাই তিনি বলের অভাবে প্রথমে নিজের গোল টুপিটা মাটিতে আছড়ে ফেললেন। কাজ না হওয়ায় পিস্তলটা ছুঁড়ে দিলেন, নস্যির ডিবে মাটিতে আছড়ালেন।

কোনোটাতেই কাজ না হওয়ায় একজন সিপাইকে হুকুম করলেন, "বাজার থেকে এক কাঁদি পাকা মর্তমান কলা নিয়ে এসো।"

কলা এল। গাছের তলায় রাখাও হল। কিন্তু ঘটোৎকচ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। আপনমনে সে গাছের ডালে বসে বলটা একবার

ছুঁড়ছে, লুফছে। ছুঁড়ছে, লুফছে। নীচের দিকে চেয়ে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে, গা চুলকোচ্ছে, নিজের পেটে ডুগডুগি বাজাচ্ছে।

সুবিধে হচ্ছে না দেখে সেপাইরা গুলি চালানোর হুকুম চাইল।

নবতারণের একটা হাবাগোবা ছেলে আছে, তার নাম শঙ্কাহরণ। সারাদিন কেবল খাই-খাই আর নানান বায়না। বুদ্ধিশুদ্ধি খুবই কম, তার ওপর ঠাকুমা আর দাদুর আদরে আরো জল-ঘট হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। নবতারণ ভাবছিলেন বাঁদরটা নিয়ে শঙ্কাহরণকে পুষতে দিলে কেমন হয়? শঙ্কাহরণের সঙ্গে পাড়া ও ইস্কুলের ছেলেরা মিশতে চায় না, বরং খেপিয়ে মারে। বোকা আর অলস প্রকৃতির হলে যা হয় আর কী। তা এই বুদ্ধিমান বাঁদরটার সঙ্গে মেশামেশি করলে শঙ্কা-হরণের মগজ কিছুটা ধারালো হতে পারে। তাই নবতারণ বললেন, "গুলি নয়, গ্রেফতার। এখন তোরা যে যার কাজে যা। কুকুর-গুলোকে পাহারায় রেখে যাস, যেন বাঁদরটা পালাতে না পারে।"

তো তাই হল। চারটে কুকুর গাছতলায় খাপ পেতে বসে রইল পাহারায়। সেপাইরা রেঁাদে গেল।

এদিকে নবতারণ থানার চার্জ নেওয়ায় হাজতের মধ্যে ভারী হতাশ হয়ে বসে আছেন মাধববাবু। জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছেন বলা যায়। বনমালী তাঁর হাঁটুতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে, "অত হাল ছেড়ে দেবেন না কর্তা, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

মাধববাবু ধরা গলায় বললেন, "শুনেছি পুলিস ধরলে সহজে ছাড়ে না। খুব মারে, খেতে দেয় না, কুটকুটে কম্বলের বিছানায় শুতে দেয়। অত কষ্ট করার অভ্যাস আমার নেই যে। তাছাড়া যদি যাবজ্জীবনের মেয়াদ বা ফাঁসির হুকুম হয়, তখন?"

কথা শুনে বনমালীর স্যাঙাতরা হি-হি করে হাসছে। বনমালী

তাদের একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলল, "আস্পদ্দা কম নয়। হেতমগড়ের মেজকর্তার সামনে হাসাহাসি ?"

ভয় খেয়ে স্যাঙাতরা চোর-চোর মুখ করে বসে রইল। তখন বনমালী বলল, "মেজকর্তার মন ভাল রাখতে হবে। ওরে, তোরা যে যার ওস্তাদি দেখা। নাচ-গান দিয়েই শুরু হোক।"

সঙ্গে সঙ্গে স্যাঙাতদের একজন নাক দিয়ে নিখুঁত আড়বাঁশির আওয়াজ ছাড়তে লাগল। আর একজন গাল ফুলিয়ে ফোলানো গালে চাঁটি মেরে তবলার আওয়াজ করতে লাগল। তৃতীয়জন রায়-বেঁশে নাচ জুড়ে দিল। বনমালী নিজে গান গাইতে লাগল।

খুবই জমে গেল ব্যাপারটা। মাধব হাঁ হয়ে দেখতে লাগলেন। নাচগান শেষ হলে বনমালীর স্যাঙাতরা নানারকম খেলা দেখাল। স্যাঙাতদের একজন হুবহু নবতারণ আর মাধব চৌধুরীর গলা নকল করে কথা বলে গেল। তারপর নানা জীবজন্তুর ডাক শোনাল। আর একজন দেখাল জিনিসপত্র হাওয়া করে দেওয়ার কায়দা। পয়সা থেকে শুরু করে চাবি কলম ইত্যাদি যা হাতের কাছে পাওয়া গেল তা নিয়ে সে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়, আর সেগুলো যেন পলকে হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়। এত সাফ হাত মাধব কোনো ম্যাজিসিয়ানের দেখেনি। সবশেষে টিকটিকিবিদ্যে-জানা বিষ্টু মাধবকে তাজ্জব বানিয়ে দিল। সে গিয়ে গরাদের সরু ফোকরের মধ্যে নিজের শরীরকে কাত করে ঢুকিয়ে একটা চাড়ি মেরে মুহূর্তের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর একটু ঘোরাফেরা করে আবার একই কায়দায় ভিতরে ঢুকে এল!

মাধব বললেন, "তা তুমি বাপু, ইচ্ছে করলেই তো এখান থেকে কেটে পড়তে পারো।"

বনমালী হেসে বলে, "তা পারে, তবে আমাদের ফেলে যাবে না। তাছাড়া আলটপকা বেরোলে সেপাইরা দড়াম করে গুলি চালাতে পারে।"

মাধবের মন অনেকটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে গুণী মানুষের সঙ্গে আছেন তা বুঝতে পেরে খুব বেশি ভয়ও আর পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাঁর খুব খিদে পেয়েছে। তাই আমতা-আমতা করে বললেন, "হ্যাঁ হে বনমালী, শুনেছিলাম হাজতে খেতে-টেতে দেয়! লপসি না কী যেন। তা এরা দিচ্ছে না কেন? রাতও তো কম হয়নি। ধারেকাছে কোনো সেপাইকেও তো দেখা যাচ্ছে না।"

কথাটা ঠিক। হাজতের সামনে দিয়ে অনেকক্ষণ কোনো সেপাই রোঁদ দেয়নি। কেউ খোঁজ-খবরও করেনি। খাবার-দাবার দেওয়ার কথাও বুঝি ভুলে গেছে।

বনমালীর ইঙ্গিতে বিষ্টু আবার গিয়ে চারদিক দেখেশুনে শরীরটাকে চ্যাপ্টা করে গরাদের ফাঁকে গলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে সে বলল, "দারুণ খবর আছে। সেই বাঁদরটার সঙ্গে থানার কুকুররা মাঠে ফুটবল খেলছে। খুব জমে গেছে খেলা। সেপাইরা সব ডিউটি ফেলে রেখে মৌজ করে খেলা দেখছে।"

"জয় কালী!" বলে লাফিয়ে ওঠে বনমালী। মাধবকে তাড়া দিয়ে বলে, "উঠে পড়ুন। এমন সুযোগ আর হবে না।"

বনমালী টপ করে তার কানে-গোঁজা বিড়িটা এনে তার ভিতর থেকে ছোট্ট একটা উকোর মতো জিনিস বের করল। গরাদের তালায় সেটা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই দরজা চিচিং ফাঁক।

সামনে একটা দরদালানের মতো। পাঁচজনে চুপিসারে সামনের দিকে এগিয়ে দেখল, সেদিকে নবতারণের অফিসঘর। অফিসঘরে নবতারণ জাঁকিয়ে বসে আছে, দরজায় তটস্থ বন্দুকধারী সেপাই। সুতরাং পালানোর পথ নেই। পিছনদিকে এসে দেখে, সেদিকেও বিপদ। সামনেই একটু খোলা মাঠ। সেখানে ইলেকট্রিকের আলোয় ঘটোৎকচ আর চারটে কুকুরের মধ্যে দারুণ বল-খেলা চলেছে। ঘটোৎকচ বল ছুঁড়ে দেয়, চারটে কুকুর বলের পিছনে দৌড়োয়। বল ধরে ঠেলতে ঠেলতে এনে তারা আবার ঘটোৎকচের কাছে হাজির করে। তাদের হাবভাব চাকর-বাকরের মতো। ঘটোৎকচ বসে আছে একটা গাছের গুঁড়ির উঁচুমতো জায়গায়, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে। তার ভাবভঙ্গি রাজা-বাদশার মতো। একটা কুকুর বেয়াদবি করে তার হাঁটুতে একটু মুখ ঘষে দেওয়ায় সে তার কান মলে দিল। আর একটা কুকুরের মাথায় হাত দিয়ে আদর করল একটু। ফলে আর দুটো হিংসেয় ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে। ঘটোৎকচ তাদের এক ধমক মারল 'হুপ' করে। ভয়ে তারা লেজ নামিয়ে ফেলল।

কতক্ষণ খেলা চলত বলা যায় না। কিন্তু এসময়ে মাধববাবু ঘটোৎকচের কাণ্ডকারখানা দেখতে দরদালান থেকে মুখটা একটু বেশিই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর ঘটোৎকচও হঠাৎ মাধববাবুকে দেখতে পেয়ে 'হুপ হুপ' বলে আনন্দের ডাক ছেড়ে তিনটে বড় বড় ডিং মেরে কুকুর এবং সেপাইদের মাথার ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে এসে মাধববাবুর গা বেয়ে উঠে গলা জড়িয়ে কুঁইমুই করে আদর জানাতে লাগল।

সকালবেলার রাগ মাধববাবুর অনেক আগেই জল হয়ে গেছে। তার ওপর এই দুঃসময়ে ঘটোৎকচের চেনা মুখখানা দেখে মাধববাবুরও

আর স্থানকালের জ্ঞান রইল না। 'ওরে আমার ঘটুরে' বলে তিনি ঘটোৎকচের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন।

বনমালী পিছন থেকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, "কর্তা! বিপদ!"

বিপদ বলে বিপদ। চোখের পলকে এক গাদা সেপাই ঘিরে ফেলল তাদের। কারো হাতে বন্দুক, কারো লাঠি, কুকুরগুলোও ঊর্ধ্বমুখ হয়ে খাপ পেতে বসে আছে, হুকুম পেলেই লাফিয়ে পড়বে। অর্থাৎ মাধববাবুর আর কিছু করার নেই। সবাই ধরা পড়ে গেছেন।

মাধববাবু দুঃখের সঙ্গে ঘটোৎকচকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, "এঃ হেঃ, প্ল্যানটা কেঁচে গেল দেখছি!"

হেড কনস্টেবল মস্ত গোঁফ চুমরে সামনে এসে মাধববাবুকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, "এ বাঁদরটা আপনার?"

মাধববাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "অনেকটা আমারই।"

"বাঁদরটাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। এর এগেইনস্টে একটা ফুটবল চুরির কেস আছে। আজ রাতে একে হাজতেই রাখা হবে। আপনারা বাড়ি চলে যান। কাল সকালে এসে খোঁজ নেবেন।"

এই বলে হেড কনস্টেবল তাঁদের নিয়ে গিয়ে পিছনের ফটক খুলে রাস্তায় বের করে দিল। বলল, "এরপর থেকে নিজের বাঁদরকে ভাল করে বেঁধে রাখবেন।"

"যে আজ্ঞে," বলে মাধববাবু খুব অমায়িকভাবে হাসলেন।

হেড কনস্টেবল ফটক বন্ধ করে দিয়ে অন্য সেপাইদের হাঁক দিয়ে বলল, "বাঁদরটাকে আলাদা সেলে ভরে দে। আর দেখ্ তো, ঐ পাঁচটা বদমাশ কয়েদি কোনো বদ মতলব ভাঁজছে কি না।"

ততক্ষণে পাঁচ কয়েদি চোঁচা দৌড়ে পগার পার হয়েছে। পাতুগড়ে আমবাগানের অন্ধকারে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বনমালী হেসে বলল,

"বাঁচা গেল।"

মাধববাবু তেমন খুশি নন। ঘটোৎকচের জন্য মনটা খারাপ। বললেন, "আমাদের জন্যই বেচারা ধরা পড়ে গেল, নইলে ঠিক পালাতে পারত।"

কেউ তাঁর কথায় জবাব করল না। সবাই হাঁফাচ্ছে। তা ছাড়া বিপদ এখনো তো কাটেনি। দৌড়তে-দৌড়তে থানা থেকে খানিক দূর আসতে না আসতেই পাগলাঘন্টির শব্দ শোনা গেছে। খুব একটা হৈ-চৈ আর হুড়োহুড়ির শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল পিছনে।

পাতুগড়ের আমবাগান বিখ্যাত জায়গা। এখানে একশো দেড়শো বছরের পুরনো বিস্তর বড়-বড় আমগাছ আছে এবং সেগুলো এখনো মাঝে মাঝে ফল দেয়। তা ছাড়া বড়বাবু কলমের বাগানও করেছেন। বিশাল একশো বিঘার মতো বাগানটার পুরোটাই নানা ঝোপঝাড়ে ঘেরা। আম-চুরি ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন গাছে মাচা বাঁধা আছে। মাচায় ফলনের সময় লোকজন থাকে। আগে বড়বাবুর বাবা-ঠাকুর্দা নিজেরাই আম পেড়ে বেচে দিতেন। বড়বাবু আর সে ঝামেলায় না গিয়ে প্রতি বছর বাগানটা বন্দোবস্তে দিয়ে দেন।

বাগানে ঘোর অন্ধকার। ভুতুড়ে কুয়াশায় চারদিকটা ছেয়ে আছে। ভাঙা বাতাসার মতো একটু চাঁদও উঠেছে আবার। তাতে চারদিকটা আরো গা-ছমছম হয়ে আছে। শীতকাল বলে আমবাগানে লোকজন নেই।

মাধব ডাকলেন, "বনমালী!"

"আজ্ঞে!"

"এখন কী হবে?"

"কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে থাকতে হবে। তাপটা কেটে যাক তারপর

যা হয় করা যাবে।"

"এখানে পুলিস আসবে না তো?"

বনমালী মাথা চুলকে বলে, "তা আসবে। যত চোর-ছ্যাঁচড় ডাকাত পুলিসের চোখে ধুলো দিতে এই আমবাগানেই আসে। পুলিসও সেটা ভালই জানে।"

মাধব ভয় খেয়ে বলেন, "তাহলে? আমার যে আবার পুলিসের ভয়টাই সবচেয়ে বেশি।"

বনমালী হেসে বলে, "পুলিস এলেই বা কী? এই আমবাগানের মতো এত ভাল চোর-পুলিস খেলার জায়গা আর কোথায় পাবেন?"

মাধব আবার ডাকলেন, "বনমালী!"

"আজ্ঞে।"

"খিদে পায় যে!"

"একটু চেপে থাকুন। ওধার থেকে টর্চ লাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। পুলিস এল বোধহয়।"

বনমালীর স্যাঙাতরা ওস্তাদ লোক। পুলিসের গন্ধ পেয়েই টপাটপ এক-একটা গাছে চড়ে অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেল। বনমালী মাধবকে আর-একটা গাছে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, "একটু ঠাহর করে উঠে যান। এ-গাছের মাচা খুব উঁচুতে নয়। আমি ধারে-কাছেই আর একটা গাছে থাকব। দেখবেন কর্তা, দয়া করে ডাকাডাকি করবেন না। বিপদে পড়লে লুকোচুরি খেলার টু দেওয়ার মতো আস্তে করে টু দেবেন।"

এই বলে বনমালীও হাওয়া হয়ে গেল।

মাধব পুলিসের আতঙ্কে প্রাণভয়ে গাছে চড়তে লাগলেন। অনেককাল এসব করা অভ্যাস নেই। তাই হাত-পায়ের চামড়া ছড়ে

গেল গাছের ঘষটানিতে। চটিজোড়া খসে পড়েছিল পা থেকে, সেটা আর তোলা হল না। অন্ধকারে ঠাহর করে করে মোটা মোটা ডাল বেয়ে খানিকটা উঠে মৃদু জ্যোৎস্নায় একটা বাঁশ আর বাখারির মাচান পেয়ে গেলেন। বিশেষ মজবুত বলে মনে হল না। উঠতেই খচমচ শব্দ করে দুলতে লাগল। গত বর্ষার জলে দড়ির বাঁধনগুলো পচে গিয়ে থাকবে। মাচানে বসে প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার চিন্তা করতে-করতে মাধববাবু একটা টু দিলেন। কিন্তু দেখলেন, ভয়ে আর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে থাকায় শব্দ হল না, শুধু ফুঃ করে একটা হাওয়া বেরিয়ে গেল।

চারদিকে কী হচ্ছে তা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না মাধববাবু, কিন্তু লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কাছেপিঠে একটা জোরালো টর্চের আলো জ্বলে উঠে নিবে গেল। গোটা তিন-চার কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল হঠাৎ। মাধববাবু সিঁটিয়ে বসে রইলেন। গাছের ওপর শীত আরো বেশি। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত পায়ে সাড় নেই। তার মধ্যে আবার টুপটাপ করে শিশিরের ফোঁটা গায়ে পড়ে ছ্যাঁক করে উঠছে। ঘোলাটে অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু কী একটা লম্বা-মতো মাধববাবুর পায়ের পাতার ওপর দিয়ে সড়াত করে সরে গেল। নীচে থেকে কে হাঁক দিল, "বড় গাছগুলো ঘিরে.ফেল।"

মাধববাবু এবার প্রাণপণের চেষ্টায় একটা টু দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছ থেকেই কে যেন পাল্টা টু দিল। কিন্তু চারদিকে চেয়ে মাধববাবু কাউকে দেখতে পেলেন না। আবার টু দিলেন। আবার টু ফেরত এল। তারপরেই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। খুবই কাছে, প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপর শ্বাসটা পড়ল। মাধববাবু চাপা স্বরে বললেন, "কে রে? বনমালী নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, "না, বনমালী নয়।"

"তবে ?"

"চিনবেন না। আমি হলাম নন্দকিশোর মুনসি।"

মাধব লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু এই আলো-আঁধারিতে কিছু ভাল করে দেখাও যায় না। না দেখলেও একটা লোক কাছে আছে জেনে মাধব খুব ভরসা পেয়ে বললেন, "ফেরারি নাকি ?"

"তাও ঠিক নয়।"

"তবে ?"

"সে অনেক গুহ্য কথা। শুনলে ভয় পাবেন।"

"পুলিস ছাড়া আমি আর কিছুকে ভয় পাই না।"

লোকটা আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, জবাব দিল না।

মাধব জিজ্ঞেস করলেন, "বড়-বড় শ্বাস ফেলছেন যে! দুঃখ-টুঃখ পেয়েছেন নাকি ?"

"তা দুঃখ আছে বই-কী। বসে বসে ভাবি, মানুষের মতো মিথ্যে-বাদী দুনিয়ায় দুটো নেই।"

মাধব এই বিপদের মধ্যেও কথাটা নিয়ে ভাবলেন। ভেবে বললেন, "সে ঠিক। তবে কিনা দুনিয়ায় মানুষ ছাড়া আর তো কেউ কথা বলতে পারে না, তাই মিথ্যেকথা বলার প্রশ্নও ওঠে না। তা আপনি কোন্ মিথ্যে কথাটা নিয়ে ভাবছেন ?"

নন্দকিশোর একটু যেন খিক খিক করে হাসল। তারপর বলল, "ছেলেবেলায় গল্প শুনতুম ভূতেরা নাকি ঘরে বসে লম্বা হাত বাড়িয়ে বাগান থেকে লেবু ছিঁড়ে আনতে পারে। তারা নাকি মাছভাজা খায়। তারা নাকি মানুষের ঘাড়ে ভর করে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটায়।"

মাধবের গা একটু ছমছম করল। তবু সাহসে ভর করে বললেন, "আমিও শুনেছি।"

"দূর দূর! তাহা মিথ্যে। ভূত হওয়ার পর আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি ভূতেদের কানাকড়ির ক্ষমতাও নেই। বাতাসের মতো ফিনফিনে শরীর নিয়ে কিছু করা যায় মশাই? আপনিই বলুন!"

এতকাল মাধবের ধারণা ছিল, তিনি পুলিস ছাড়া আর কাউকে ভয় পান না। এখন একেবারে কাঠ হয়ে বসে থেকে তিনি টের পেলেন, দুনিয়ায় আরো বিস্তর ভয়ের ব্যাপার রয়ে গেছে। কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "দোহাই মশাই, আমাকে আর ভয় দেখাবেন না। আমি ভূতকেও ভীষণ ভয় পাই।"

নন্দকিশোর গম্ভীর হয়ে বলে, "ভূতকে ভয় পায় মূর্খেরা। বললাম তো, ভূতেদের কানাকড়ির ক্ষমতাও নেই। থাকলে এক্ষুনি ঐ পুলিস-গুলোকে ডেকে আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম। না হয় তো আপনাকে এই মাচান থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিতাম।"

মাধববাবু সভয়ে মাচার বাঁশ চেপে ধরে বললেন, "ওসব কী কথা? ফেলে দিলে হাড়গোড় ভাঙবে যে!"

"দূর মশাই!" নন্দকিশোর ধমক দিয়ে বলে, "বলছি না ফেলবার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা নেই!"

"কিন্তু যদি পুলিসকে ডাকেন?" মাধব সন্দেহে কাঁটা হয়ে বলেন।

"ডাকব কী? আমার গলার স্বর ওদের কানে যাবে বুঝি? আপনি যেমন! আমার কথা আমি নিজেও শুনতে পাই না।"

"তবে আমি শুনছি কী করে?"

"বিপদে পড়ে আপনার চোখ কান নাক ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ু অত্যন্ত বেশি সজাগ হয়ে ওঠায় অনুভূতির ক্ষমতা খুব বেড়ে গেছে। আমার গলার স্বর বলে কিছুই নেই। আপনি যা শুনতে পাচ্ছেন তা হল

একটা চিন্তার তরঙ্গ মাত্র। অন্য কোনো ভোঁতা লোক হলে কিছুই শুনতে পেত না।"

মাধববাবু এই দুঃসময়েও একটু খুশি হলেন। তিনি তাহলে ভোঁতা লোক নন! গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "যথার্থই বলেছেন।"

নন্দকিশোরের আর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে বলে, "এ-বাগানে ফলনের সময় যত চৌকিদার পাহারায় থাকে, আমি তাদের সকলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কাজ হয়নি। যত চোর-ডাকাত এসে এখানে গা-ঢাকা দেয় তাদেরও অনুভূতি বলে কিছু নেই। আজই প্রথম একটা চোরকে দেখলাম যে আমার কথা শুনতে পেল।"

"চোর?"

নন্দকিশোর নির্বিকারভাবে বলে, "চোর বললে যদি রাগ হয় তবে না হয় তস্করই বললাম। কিন্তু আপনার মতো ভিতু লোক যে ডাকাত বা গুণ্ডা হতে পারে না তা আমি দেখেই বুঝেছি।"

মাধববাবু একটু রেগে গিয়ে বলেন, "আমি ওসব কিছুই নই। আমি হচ্ছি হেতমগড়ের মেজকুমার। পুলিস আমাকে বিনা দোষে ধরেছিল। আমি পালিয়ে এসেছি।"

নন্দকিশোরের খিক-খিক গা-জ্বালানো হাসি শোনা যায়। সে বলে, "সে কথা পুলিসকে বলে দেখবেন বরং। ঐ তারা এসে গেছে।"

মাধব নীচের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে যান। আবছা অন্ধকারে দেখতে পান গোটা-দুই কুকুর গাছের তলায় ঘুরঘুর করে কী যেন শুঁকছে। তাঁর চটিজোড়া নয় তো?

এই সময়ে একটা জোরালো টর্চের আলো পড়ল গাছতলায়। নবতারণ বাজখাঁই গলায় বললেন, "এই গাছে একটা বিটলে আছে। ওরে, তোরা বন্দুক উঁচিয়ে থাক। পুঁটিরাম আর ভজহরি গাছে ওঠ।"

মাধববাবুর যখন সাঙ্ঘাতিক বিপদ তখনো নন্দকিশোর পিছন থেকে বলল, "আপনি দেখছি চোর হিসেবেও নিতান্তই কাঁচা। চটিজোড়া গাছতলায় ছেড়ে এসেছেন। অ্যাঁ? আর আমি ভাবছিলাম আপনি ভোঁতা লোক নন!"

মাধববাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। জমিদারদের রক্ত এখনো তাঁর গায়ে আছে। এই সেদিনও তাঁর ঠাকুর্দা রাগ হলে গাছে চড়ে বসে থাকতেন। তিনি না রেগেই গাছে চড়েছেন বটে, কিন্তু এখন গাছে চড়ার পর তাঁর রাগটাও হল। সারাদিন আজ নানারকম হ্যাপা গেছে, তার ওপর এখন বিপদের মুখে আবার ভূতের অপমান! মাধব গর্জন করে বললেন, "চটি ছেড়ে আসব না তো কি কোঁচড়ে করে নিয়ে আসব? জানেন, আমাদের বংশে কেউ কখনো নিজের চটি নিজে পরেনি বা নিজে ছাড়েওনি? বাইশজন চটি-বরদার ছিল আমাদের, বিশ্বাস হয়? আমার বাবার পা থেকে জুতো খোলার লোক ছিল না বলে তিনি শ্বশুর-বাড়িতে এক রাত্রি জুতো পায়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। তা হলে বুঝুন আমি কার ছেলে, কোন্ বংশের লোক! আমরা কখনো নিজের চটি নিজের হাতে ছুঁই না। তা জানেন?"

নন্দকিশোর মোলায়েম গলায় বলে, "চটির কথাটায় আপনার খুব লেগেছে দেখছি। আমি কিন্তু আপনাকে চটি নিয়ে খোঁটা দিইনি। বলছিলাম, চুরি-চামারি করতে গেলে অত লপেটা-বাবু সেজে বেরোলে কি হয়? চটি পরে কেউ চুরি করতে যায়? এ হচ্ছে অতিশয় কাঁচা তস্করের কাজ।"

মাধববাবু হুংকার দিয়ে বললেন, "ফের তস্কর বললে এক থাপ্পড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।"

নন্দকিশোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "দাদারে, সেই সুখের দিন কি আর আছে? আমাকে থাপ্পড় মারা অত সোজা নয়।"

"বটে!" বলে মাধববাবু গর্জন করে করাল চোখে চারদিকে চেয়ে লোকটাকে খুঁজতে লাগলেন।

"এই তো আমি। এই যে একটু বাঁয়ে ঘেঁষে তাকালেই দেখতে পাবেন।" বলে নন্দকিশোর নিজের অবস্থানটা জানাতে থাকে মাধবকে।

বাঁয়ে তাকিয়ে মাধব দেখেন, গাছের ফোকর দিয়ে আসা একমুঠো জ্যোৎস্নায় বিঘতখানেক লম্বা তুলোর আঁশের মতো একটা জিনিস বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাসতে-ভাসতেই তিড়িক করে লাফিয়ে মাধবের নাকের ডগায় এসে নাচতে-নাচতে বলল, "মারবে থাপ্পড়? মারো না দেখি!"

তা মাধব মারলেন। জীবনে কাউকে এত জোরে আর এত রাগের সঙ্গে থাপ্পড় মারেননি। সজোরে হাতটা বাতাস কেটে বাঁই করে ঘুরে এল আর সেই থাপ্পড়ের টানে মাধব নিজেও ঘুরে গেলেন। এক পাক ঘুরলেন, দু পাক ঘুরলেন, তারপর ঘুরতে-ঘুরতেই মাচান থেকে এরোপ্লেনের মতো ভেসে পড়লেন, শূন্যে।

দমাস করে বিরাট এক শব্দ। নবতারণের হাত থেকে টর্চটা ছিটকে গেল। কুকুর দুটো লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে পালাল। পুঁটিরাম আর ভজহরি গাছের মাঝ-বরাবর পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। হঠাৎ আঁতকে ওঠায় তারাও হাত-পা ফস্কে নীচে পড়ল। গাছের তলায় অন্ধকারে সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। গাছের ওপর ঘুমন্ত পাখিরা ঘুম ভেঙে আতঙ্কে কা-কা ক্যাচর-ম্যাচর করতে লাগল।

নবতারণ মূর্ছা গিয়েছিলেন। পনরো-বিশ ফুট উঁচু থেকে দেড়-দু'

মনি জিনিস কারো ঘাড়ে পড়লে তার মূর্ছা যাওয়াটা কোনো কাপুরুষের লক্ষণ নয়। নবতারণ কাপুরুষ ননও। তবে তাঁর মতো শক্ত ধাতের মানুষ মূর্ছা যাওয়ায় সেপাইরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ফলে অন্ধকারে কী যে ঘটে গেল তাদের নাকের ডগায়, তা তারা ভাল করে ঠাহর পেল না। তবে সকলেই কাজ দেখাতে এদিক-সেদিক 'পাকড়ো পাকড়ো' বলে দৌড়তে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদেই অবশ্য নবতারণ চোখ খুললেন। তবে যে নবতারণ চোখ খুললেন, তিনি আর আগের নবতারণ নন। এত কাহিল হয়ে পড়েছেন যে, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। গায়ে-গতরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। খানিক বাদে একটু ধাতস্থ হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘোলাটে মগজটাকে সাফ করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন নবতারণ, এমন সময়ে খুব কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এইসব ননীর পুতুলকে আজকাল দারোগার পোস্টে প্রোমোশন দিচ্ছে নাকি ? হুঁ, দারোগা ছিল বটে আমাদের আমলের নিশি দারোগা, একটা আস্ত কাঁঠাল খেয়ে ফেলত। গোটা খাসির মাংস হজম করত। সাত ফুট লম্বা ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি, কিল দিয়ে পাথর ভাঙত।"

নবতারণের ঘোলাটে বুদ্ধি সাফ হয়ে গেল, গায়ের ব্যথাও গেল উবে। অপমানের জ্বালায় এক লাফে উঠে হুংকার ছাড়লেন, "কার রে এত সাহস, সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস ?"

খিক করে একটু হাসির শব্দ হল। কে যেন বলল, "বেশি রোয়াবি দেখিও না। আমি কত বুদ্ধি খাটিয়ে চোরটাকে গাছ থেকে নীচে ফেললাম, আর তুমি তাকে কোলের মধ্যে পেয়েও ধরে রাখতে

পারলে না। মাইনে নাও কোন লজ্জায় ?"

নবতারণ খাপ থেকে রিভলভার বের করে বললেন, "সাহস থাকে তো সামনে এসে কথা বল্‌।

"সাহসের কথা আর বোলো না। তুমি যা বীরপুরুষ, তাতে চামচিকেও তোমাকে ভয় খাবে না। আমি সামনেই আছি, কী করবে করো না।"

নবতারণ মহিষের মতো শ্বাস ফেলে, দাঁতে দাঁত পিষে জাঁতার মতো শব্দ করে বললেন, "কই তুই ?"

"এই যে !" বলে বিঘত-খানেক লম্বা সাদাটে নন্দকিশোর মুনসি একেবারে নবতারণের নাকের ডগায় নাচতে লাগল। সঙ্গে খিক-খিক করে হাসি।

নবতারণ চাঁদের ঘোলাটে আলোয় নিজের নাকের ডগায় এই অশরীরী কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন প্রথমটায়। তারপর পিছু ফিরে দৌড়োতে-দৌড়োতে চেঁচাতে লাগলেন, "পুঁটিরাম ! ভজহরি ! ভূত ! ভূত !"

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমবাগান সাফ হয়ে গেল।

৪

বিপদ ঘটলে মানুষ তখন-তখন যতটা ভয় পায়, তার চেয়ে আরও বেশি ভয় পায় বিপদ কেটে যাওয়ার পর সেই বিপদের কথা ভেবে।

মাধবেরও হয়েছে তাই। ভূতকে চড় মেরেছেন, গাছ থেকে নবতারণের ঘাড়ে পড়েছেন, তারপর অন্ধকারে অনেকটা পথ দৌড়ে গাছ-গাছালির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে, অতি কষ্টে নদীর ধারে পৌঁছে গেছেন। নদীর ধারে বসে জিরোতে জিরোতে গোটা ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে এখন হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠে কাঠ হয়ে গেলেন। সাক্ষাৎ পুলিস এবং সাক্ষাৎ ভূতের পাল্লা থেকে কপাল-জোরে বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখন ভয়ে শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর এক পা'ও চলার ক্ষমতা ছিল না।

এমনই গ্রহের ফের যে, কিছুতেই 'রাম'-নামটাও মনে আসছে না। দশরথ, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ভরত, এমনকী মন্থরার নামও মনে পড়ছে, কিন্তু দশরথের বড় ছেলের নামটা জিবে আসছে না। বসে প্রাণপণে বিড়-বিড় করছেন, "আরে ঐ যে দশরথের বড় ছেলেটা···আরে ঐ তো বনবাসে গিয়েছিল···সোনার হরিণের পিছু নিয়েছিল যে ছোকরা ···আহা কী যেন নাম···আরে ঐ তো রাবণরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করল ···হনুমানের খুব ভক্ত ছিল···না না, হনুমানই সেই ছোকরার খুব ভক্ত

ছিল···আরে দ্যাখো কাণ্ড, হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করল যে লোকটা···”

ঠিক এই সময়ে কানে কানে কে যেন বলে দিল, “রামের কথা ভাবছ তো! খিক-খিক! তা ভাল, খুব কষে রাম-নাম করে যাও, কিন্তু তাতে লাভ নেই।”

মাধব হিম হয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখেন, নাকের ডগায় নন্দকিশোর মুনসি।

নন্দকিশোর বলে, “ওসব লোকে রটিয়ে বেড়ায়। ভূতের নামে কত যে মিথ্যে কথা রটায় লোকে, তার লেখাজোখা নেই। বলে, রাম-নাম করলে নাকি ভূতে ভয় খায়! খিক-খিক!”

মাধবের গলায় কথা সরছিল না। তবু কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললেন, “তবে ভূতে কিসে ভয় খায়?”

নন্দকিশোর খুব খিক-খিক করে হাসে। বলে, “তোমারও যেমন বুদ্ধি! ভূতে কিসে ভয় খায় সেই গুহ্যকথা আমি তোমাকে বলতে যাব কেন হে!”

“আমার যে ভীষণ ভয় করছে!” মাধব বলেন।

“তুমি মুর্খ, তাই ভূতকে ভয় খাও! গাছের ওপর তোমাকে কত করে বোঝালাম যে, ভূতের একরত্তি ক্ষমতা নেই, তাই তাকে ভয় খাওয়ারও কিছু নেই। আবার ভূতকে ভয় খাওয়ানোও ভারী শক্ত। ভূতকে মারা যায় না, তা তো নিজেও দেখলে। ভূতের সাপের ভয় নেই, চোরডাকাত বা পুলিসের ভয় নেই, বন্দুক বা তলোয়ারেও ভয় নেই, এমনকী সবচেয়ে বড় কথা কী জানো?”

“কী?”

“সবচেয়ে বড় কথা হল, ভূতের আবার ভূতের ভয়ও নেই। আর

রামের মতো ভালমানুষকে আমরা ভয় পেতে যাবই বা কেন? রাম তো আর ভূতের নিদান দিয়ে যাননি! তাঁর আরও অনেক গুরুতর কাজ ছিল।”

মাধব ভয়ে ভয়ে বললেন, “তাহলে রাম-নাম করে লাভ নেই বলছেন?”

“লাভ একেবারে নেই তা বলিনি। রাম-নামে পাপ-তাপ কাটে, মনটা উঁচুতে ওঠে, প্রাণটা বড় হয়, ভক্তিভাব আসে, গায়ে শক্তিবৃদ্ধি হয়, মনোবল বাড়ে। কিন্তু তা বলে রাম-নাম করে আমাকে ভয় খাওয়াতে পারবে না।”

শক্ত পাল্লায় পড়েছেন বুঝতে পেরে মাধব কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, “আপনাকে চড় মারাটা আমার ভারী অন্যায় হয়েছিল।”

নন্দকিশোর খিক-খিক করে হেসে বলে, “আরে দূর দূর! তুমিও যেমন! তুমি তো চড় মারতে গিয়েছিলে, নবতারণ দারোগা পিস্তল বের করেছিল। খিক-খিক! সাধে কি তোমাদের মূর্খ বলি? তোমার চড় আমার লাগলে তো? আমি কিছু মনে করিনি। তবে তোমার মতো চোর-জোচ্চরদের শাস্তি হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। সেইজন্যই আমি চেয়েছিলাম নবতারণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে তোমাকে ধরিয়ে দেব। কিন্তু দারোগা এমন ভয় খেয়ে গেল যে, পালিয়ে বাঁচে না।”

“আজ্ঞে আমি চোর নই। বিশ্বাস করুন।”

নন্দকিশোর গম্ভীর হয়ে বলল, “কোনো চোরই নিজেকে চোর বলে স্বীকার করে না। তুমি চোর কি না তা জানতে হলে আমাকে তোমার ভিতরে ঢুকতে হবে।”

“অ্যাঁ” বলে আঁতকে ওঠেন মাধব।

নন্দকিশোর বলে, "ভয়ের কিছু নেই। যাব আর আসব। দশ মিনিটও লাগবে না।"

নন্দকিশোর ভূত হলেও বিঘত খানেক লম্বা এবং ভাল সাইজের মর্তমান কলার মতোই পুরুষ্টু। মাধব কঁকিয়ে উঠে বললেন, "ভিতরে গিয়ে দেখবেনটা কী?"

"তোমার মগজ দেখব, বিবেক দেখব, তোমার মনটা কেমন তা বিচার করব, তারপর বুঝব তুমি চোর কি না।"

"কোথা দিয়ে ঢুকবেন?"

"নাক কান মুখ সব পথেই ঢোকা যায়। তবে নাক কান হচ্ছে গলিপথ। আমি গলি দিয়ে যাতায়াত পছন্দ করি না। মুখ হল রাজপথ। আমি রাজপথই পছন্দ করি। তুমি হাঁ করো।"

মাধব ইতস্তত করে বলেন, "গলায় যদি আটকে যায়, তাহলে তো বিষম খেয়ে মরব। আমি বলি কী, পুরোটা একসঙ্গে না ঢুকে আমি বরং আপনাকে একটু-একটু করে চিবিয়ে খেয়ে নিই।"

"দূর দূর! তুমিও যেমন! হাঁ করে থাকো, টেরই পাবে না। আমি এমন কায়দায় ঢুকে যাবো।"

অগত্যা মাধবকে হাঁ করতে হল। নন্দকিশোর ডাইভ মেরে ভিতরে ঢুকে গেলেন। মাধব টের পেলেন একটা নরম আইসক্রীমের মতো ঠাণ্ডা জিনিস তার টাগরায় গোঁত্তা মেরে গলা দিয়ে নেমে গেল। বেশ বড় রকমের একটা ঢেঁকুর তুললেন মাধব। তারপর কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

ছেলেবেলায় হাঁ করে কাঁদতে গিয়ে একবার একটা মাছি গিলে ফেলেছিলেন মাধব। দুধ খেতে গিয়ে মাঝে-মাঝে এক-আধটা পিঁপড়েও পেটে গেছে। আহাম্মক মশা অনেক সময় বে-খেয়ালে

মানুষের মুখে ঢুকে গিয়ে পেটসই হয়ে যায়, তাই জীবনে বেশ কয়েকটা মশাও হয়তো মনের ভুলে গিলে ফেলেছেন তিনি। তাছাড়া ওষুধের বড়ি, চিরতার জল, তেতো পাঁচন সবই খেয়েছেন। কিন্তু ভূত-গেলা এই তাঁর প্রথম। নন্দকিশোরকে গিলে ফেলার পর তিনি স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ আমি কী করলাম ?

ওদিকে নবতারণ হতাশ হয়ে সদলবলে থানায় ফিরেই দেখলেন একজন গোঁফওয়ালা ভারী চেহারার বিশিষ্ট ভদ্রলোক বসে আছেন। গম্ভীর গলায় বললেন, "আমি হচ্ছি বিজয়পুরের জমিদারের নায়েব। খবর পেয়েছি, জমিদারমশাইয়ের ছোট জামাই মাধব চৌধুরীকে এই থানায় আটক রাখা হয়েছে। খবরটা কি সত্যি ?"

বিজয়পুরের জমিদারের জমিদারি এখন আর নেই বটে, কিন্তু তাঁরা তিনটে জাহাজের মালিক, তামাকপাতার মস্ত ব্যবসা আছে, আরো হাজার রকমের কারবারে তাঁদের লাখ-লাখ টাকা খাটছে। তাঁদের ভয়ে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। সুতরাং নবতারণ মাথা চুলকোতে লাগলেন। এই থানার চার্জ নিয়ে এক দিনেই এই বিপত্তি দেখে তিনি অন্য থানায় বদলি হওয়ার কথাও ভাবলেন। তারপর কাচুমাচু মুখে বললেন, "তাঁকে কি ছেড়ে দেওয়ার হুকুম আছে ?"

নায়েবমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, "না। বরং তাঁকে খুব ভাল করে আটকে রাখবেন। কারণ, লোকটা খুবই খ্যাপাটে আর রাগী। বিয়ের রাতে তাঁকে শালীরা সুপুরিসুদ্ধ নাড়ু খেতে দিয়েছিল বলে তিনি রাগ করে চলে আসেন, আর কখনো শ্বশুরবাড়িতে যাননি। জমিদারমশাইও ওরকম আহাম্মক জামাইয়ের মুখদর্শন করতে চাননি। কিন্তু এখন মেয়ের কান্না-কাটিতে তাঁর মন নরম হয়েছে। কিন্তু জামাইয়ের হাতে-পায়ে ধরে যেচে সেধে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার

মানুষ তিনি নন। তাই জামাইয়ের গ্রেফতারের খবরে তিনি খুশিই হয়েছেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, কাল সকালের মধ্যেই মাধব চৌধুরীকে পুলিসের পাহারায় গ্রেফতার অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে যেন হাজির করা হয়।"

নবতারণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে টাকের ছাল তুলে ফেললেন প্রায়। হেঃ হেঃ করে বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "কিন্তু মুশকিল হল, আমরা যখনই শুনলাম যে, তিনি বিজয়পুরের ছোট জামাই, তক্ষুনি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি। উনি তো এখন থানায় নেই।"

নায়েব আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, "তাহলে আবার এক্ষুনি তাঁকে গ্রেফতার করে আনুন। কাল সকালে তাঁকে গ্রেফতার অবস্থায় বিজয়পুরে হাজির না করলে কর্তা খুবই রেগে যাবেন। কারণ, তাঁর ছোট মেয়ে বলে দিয়েছে, তার স্বামীকে আর তিন দিনের মধ্যে হাজির না করতে পারল সে বিষ খাবে বা গলায় দড়ি দেবে। জমিদারেরই মেয়ে তো, ওদের কথার নড়চড় হয় না। আপনি আর দেরি না করে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। ঠিকমতো জামাইকে হাজির করতে পারলে কর্তা প্রচুর পুরস্কার দেবেন।"

এই বলে নায়েবমশাই উঠে পড়লেন।

নবতারণ বসে বসে টাক চুলকোতে লাগলেন। জীবনেও এমন মুশকিলে পড়েননি। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। বিজয়পুরের জমিদারের সঙ্গে হর্তাকর্তাদের খুব খাতির। চটে গেলে নবতারণের চাকরি খেয়ে নিতে পারেন।

ওদিকে থানার গারদে ঘটোৎকচ প্রচণ্ড হম্বিতম্বি করছে। তার খাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে, ঘুমও পেয়েছে। কিন্তু বাঁদরকে খাবার দেওয়ার কথা কারও মনে পড়েনি। তাছাড়া কুটকুটে কম্বলের

বিছানায় শুয়ে থাকা ঘটোৎকচের অভ্যাস নেই। ফলে সে ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়ছে, গরাদ বেয়ে উঠছে, নামছে। সে একটু মোটাসোটা বলে গরাদের ফাঁক দিয়ে বেরোতেও পারছে না। তবে তার মধ্যেই সে ঠ্যাং বাড়িয়ে একজন সেপাইকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। আর একজনের চুল খামচে আচ্ছা করে মাথাটা ঠুকে দিয়েছে লোহার দরজায়। সেপাইরা রেগে গেলেও কিছু বলেনি, কারণ দারোগাবাবুর ছেলের জন্য বাঁদরটাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাঁদরের হুপহাপ শুনে নবতারণ হঠাৎ গর্জন করে বললেন, "সব দোষ বেয়াদপ বাঁদরটার। নিয়ে আয় তো ওকে, আচ্ছাসে ঘা কতক দিই।"

সঙ্গে-সঙ্গে সেপাইরা ঘটোৎকচকে আচ্ছাসে দড়ি দিয়ে বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এল। ঘটোৎকচ জানে, এই অবস্থায় তেড়িমেড়ি করা ঠিক নয়। তাই সে খুব লক্ষ্মী ছেলের মতো কোনো গোলমাল করল না। এমনকী, সামনে হাজির হয়ে সে দারোগাবাবুকে হাতজোড় করে একটা নমস্কারও করল।

নবতারণ একটু নরম হয়ে বললেন, "ব্যাটা সহবত জানে দেখছি!"

শুনে ঘটোৎকচ নবতারণকে একটা সেলামও দিল।

"বাঃ বাঃ!" খুশি হলেন নবতারণ।

উৎসাহ পেয়ে ঘটোৎকচ নিজের কান ধরে জিব বের করে খুব অনুগমনের ভঙ্গি করল।

নবতারণ বহুক্ষণ বাদে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

ঘটোৎকচ তখন কান ধরে ওঠবোস করল, মাটিতে উবু হয়ে নাকে খত দিল, তারপর লজ্জার ভান করে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে রাখল।

নবতারণ এইসব কাণ্ড দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, বড়বাবু তায়েবজি আর অক্ষয় খাজাঞ্চি যে কখন ঘরে ঢুকে পড়েছেন তা টের পাননি !

বড়বাবুও জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর তেমন হাঁকডাক নেই। নরম মানুষ বলে তাঁকে কেউই তেমন ভয়ও খায় না। উল্টে তিনিই বরং অনেক কিছুকে ভয় খান। দারোগা-পুলিসকেও তাঁর ভীষণ ভয়।

তাই ভয়ে-ভয়ে থানায় ঢুকে গলা খাঁকারি দিয়ে অনেকবার দারোগাবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। তাতে কাজ হল না দেখে খুব ভয়ে-ভয়ে নবতারণের আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "ইয়ে, আমার শালা মাধব চৌধুরীকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে ?"

নবতারণ একটু চমকে উঠে আপাদমস্তক বড়বাবুকে দেখে নিলেন। তারপর ব্যঙ্গ-হাসি হেসে বললেন, "চালাকি করার আর জায়গা পেলেন না ? মাধব চৌধুরী আপনার শালা হতে যাবেন কেন ? তিনি তো বিজয়পুরের জমিদারের ছোট জামাই।"

বিজয়পুরের জমিদারের জামাই তাঁর শালা হতে পারবে না কোন্ যুক্তিতে তা বুঝতে না-পেরেও বড়বাবু নবতারণকে চটাতে সাহস পেলেন না। বললেন, "সে কথা অবশ্য ঠিক।"

নবতারণ মৃদু হেসে বললেন, "তবেই বুঝুন, চালাকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় কিনা।"

"আজ্ঞে না।" বড়বাবু হতাশ হয়ে বললেন।

অক্ষয় খাজাঞ্চি অবশ্য গলায় একটু সন্দেহ রেখেই বললেন, "তবে কিনা অনেকের এমন জামাইও আছে যারা কিনা আবার অন্য কারো শালাও।"

তায়েবজিও খুব বিনয়ের সঙ্গে অক্ষয় খাজাঞ্চিকে সমর্থন করে বলল, "এই তো আমারই এক শালা আছে যে কিনা ঘুরঘুটপুরের ঘুসুরামের জামাই।

নবতারণ কটমট করে তায়েবজির দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিলেন, "এরকম সব হয় নাকি ?"

অক্ষয় খাজাঞ্চি মিনমিন করে বললেন, "কাজটা হয়তো বেআইনি। এরকম হওয়া উচিতও নয়। তবে হচ্ছে, আকছার হচ্ছে।"

কোথাও একটা ভুল হচ্ছে বুঝতে পেরে নবতারণ গর্জন করে বললেন, "দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান ! ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই। মাধব চৌধুরী হলেন বিজয়পুরের বড়কর্তার জামাই, তার মানে উনি বড়-কর্তার মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তাহলে উনি হলেন বড়কর্তার ছেলেদের সম্পর্কে শালা।"

বড়বাবু জিব কেটে বললেন, "আজ্ঞে না, উনি সেক্ষেত্রে হবেন ভগ্নীপতি।"

"বললেই হল ?" নবতারণ আবার কটমট করে তাকান। তারপর একটু ভেবেচিন্তে বললেন, "না হয় তাই হল। কিন্তু শালাটা তাহলে কী করে হচ্ছেন ?"

বড়বাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "ওঁর এক দিদি আবার আমার স্ত্রী কিনা।"

"তাতে কী হল ? ওঁর দিদি আপনার স্ত্রী মানে আপনি ওঁর কী হলেন ?"

"ভগ্নীপতি।"

"তাহলে শালাটা আসছে কোত্থেকে ? এ তো ভারী গোলমেলে ব্যাপার দেখছি।"

"আজ্ঞে, ভগ্নীপতিদের শালা থাকেই।"

নবতারণ টাক চুলকোতে-চুলকোতে ডাক দিলেন, "দারোয়াজা!"

গেটের সিপাই দৌড়ে এসে সেলাম দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

নবতারণ হুঙ্কার দিলেন, "তুই কার জামাই?"

"জি, আমি সীতারামপুরের দশরথ ওঝার জামাই।"

"তাহলে তুই কার শালা হলি?"

"আমি কারো শালা-উলা নই।"

"তবে?" নবতারণ বড়বাবুর দিকে চাইলেন।

বড়বাবু মাথা চুলকে বললেন, "ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনি নিজের ঘাড়ে ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবেন। মানে ধরুন, আপনি নিশ্চয়ই কারো জামাই, আবার হয়তো কারো শালাও।"

নবতারণ হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন, "নিজের পরিবার নিয়ে ভাবি নাকি? মনে করেন কী আমাকে? দিন-রাত চোর-জোচ্চোর ধরে বেড়াব না সারা দিন বসে কে কার শালা আর কে কার জামাই তাই নিয়ে ভাবব? তাছাড়া পারিবারিক সম্পর্কগুলোও ভারী গোলমেলে। আমার স্ত্রীর এক বোনকে তো আমি আমার ননদ বলে ফেলেছিলাম, তাইতে স্ত্রী আমাকে এই মারে কি সেই মারে।" বলে নবতারণ আবার গর্জন করে সেপাইকে বললেন, "এই দরোয়াজা, তোর বোন আছে?"

"আজ্ঞে।"

"তার বিয়ে দিয়েছিস?"

"আজ্ঞে।"

“বোনের স্বামীর কি তুই শালা হলি তবে?”

সেপাইটা এতক্ষণে ফটকে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছে? সে দারোগা-বাবুকে খুশি করতে খুব দৃঢ় স্বরে বলল, “কক্ষনো নয়।”

নবতারণ বিজয়ীর মতো বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তবে?”

বড়বাবু মাথা চুলকে বললেন, “এক্ষেত্রে সম্বন্ধী হবে।”

নবতারণ আবার হাঁক মারলেন, “দরোয়াজা!”

“আজ্ঞে।”

“তুই কি তোর বোনের স্বামীর সম্বন্ধী?”

দরোয়াজা সে কথার জবাব দিল না, শুধু বিকট একটা ডাইভ মেরে দরজার চৌকাঠ বরাবর লম্বা হয়ে মেঝেয় পড়ে চেঁচাতে লাগল, “আহা হা! লেজটা হাতে পেয়েও রাখতে পারলাম না! আঃ হায় রে! একটুর জন্য হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল রে!”

নবতারণ লাফিয়ে উঠলেন, “কী হয়েছে, অ্যাঁ? কী হয়েছে?”

ততক্ষণে থানায় হুলস্থূল পড়ে গেছে, সেপাইরা দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে, কুকুররা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

শালা সম্বন্ধী জামাই নিয়ে কূটকচালির সময় ফাঁক বুঝে ঘটোৎকচ স্রুট করে কেটে পড়েছে!

পাতুগড়ের আমবাগান নিঃঝুম হয়ে আসার পর বনমালী গাছ থেকে নেমে এসে চারটে টু দিল। টু শুনে আর তিনটে গাছ থেকে তার তিন স্যাঙাত নেমে এল।

বনমালী জিজ্ঞেস করল, “ব্যাপারটা কী রে?”

ফুচুলাল বলল, “আজ্ঞে ঠিক ঠাহর পেলাম না। তবে মনে হল গাছ থেকে মাধববাবু পড়ে গেলেন আর তারপর সেপাইরা ভূত-ভূত

বলে চেঁচিয়ে পালাল।"

বনমালী গম্ভীর হয়ে বলল, "এক্ষুনি সব কর্তাকে খুঁজতে লেগে যাও। খুঁজে বের করতেই হবে। হাঁক-ডাক করতে থাকো, শুনতে পেলে কর্তা সাড়া দেবেন।"

সুতরাং বনমালী আর তার স্যাঙাতরা প্রাণপণে মাধবকে ডাকতে-ডাকতে চারদিকে চলে গেল।

কিন্তু নন্দকিশোরকে গিলে ফেলার কিছুক্ষণ বাদেই মাধবের ভীষণ হাই উঠতে লাগল, গায়ে হাতে আড়মোড়া ভাঙতে লাগলেন। তারপর এই প্রচণ্ড শীতেও গাছতলায় শুয়ে ঢলাঢল ঘুমোতে লাগলেন। সে ঘুম ভাঙায় কার সাধ্যি! আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে যে জায়গায় শুয়ে ছিলেন, সেখানে তাঁকে খুঁজে বের করার সাধ্যিও কারও ছিল না।

ভোরের দিকে আলো যখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে, তখন গাছ থেকে জাম্বুবান ঘটোৎকচ তাঁকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে নামল, এবং প্রচণ্ড কিচিরমিচির শব্দ করে আহ্লাদ প্রকাশ করতে লাগল। কখনো চুল টানে, কখনো চিমটি কাটে, কখনো গা ধরে ঝাঁকায়।

মাধব ধীরে-ধীরে চোখ খুললেন। মাধববাবু টের পাচ্ছিলেন, এই পৃথিবীতে তাঁর আপনজন বলে কেউ নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ের রাতে রাগ করে চলে এসেছিলেন। সেই থেকে শ্বশুরবাড়ির কোনো প্রাণীও তাঁর খোঁজ নেয় না। এমনকী, বিয়ে-করা বউও নয়। বড়বাবুর বাড়িতে যত্নেই আছেন বটে, কিন্তু সেও তো ভগ্নীপতির বাড়ি, নিজের বাড়ি তো নয়। নিজের বলতে ছিল হেতমগড়ের প্রাসাদ, তা সেও সরস্বতীর গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এইসব ভেবে মনটা বরাবরই তাঁর একটু বিষণ্ণ থাকে। তার ওপর কাল পুলিসের

অত্যাচার এবং ভূতের তাড়নায় আরও কাতর হয়ে পড়েছেন মাধব। এই দুঃসময়ে ঘটোৎকচকে পেয়ে বড় ভাল লাগল। আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "প্রাণের টান যাবে কোথায়? দুনিয়ায় এখন তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

ঠিক এই সময়ে বনমালী ঝোপঝাড় ভেঙে সামনে হাজির হয়ে এক গাল হেসে বলল, "না, আজ্ঞে, আমরাও আছি।"

মাধব বনমালীকে দেখে অকূলে কূল পেলেন। বললেন, "আঃ, বাঁচালি বাবা বনমালী।"

"বাঁচার এখনো একটু কষ্ট আছে কর্তা। পুলিস বাগান ঘিরে ফেলতে আসছে। আলো ফুটবার আগেই আমাদের নদী পেরিয়ে যেতে হবে। এবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। উঠে পড়ুন।"

পুলিসের নামে মাধব বাধ্য ছেলের মতো উঠে পড়লেন। বললেন, "চল।"

বর্ষাকালে ভয়ঙ্করী হলেও এই শীতে সরস্বতীর জল খুব কম। বড়-বড় বালির চর জেগে উঠেছে। চরের এপাশ-ওপাশ দিয়ে ক্ষীণ জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। হাঁটুর বেশি জল কোথাও নেই। কাজেই নদী পেরোতে কারোই কষ্ট হল না। ঘটোৎকচ বনমালীর কাঁধে চেপে দিব্যি আরামে পেরিয়ে গেল। পুলিস যখন বাগান ঘিরে কুকুর ছেড়েছে ততক্ষণে নদীর ওপারের জঙ্গলে অনেকখানি সেঁধিয়ে গেছেন মাধব আর তাঁর দলবল।

আগের দিন বিকেল থেকে কারো খাওয়া নেই। খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে। এই শীতে আম কাঁঠাল না হলেও জঙ্গলে বিস্তর পুঁতির মতো ছোটো-ছোটো বুনো কুল আর বনকরমচা ফলে আছে। মিষ্টি যেন গুড়। কাঁটাঝোপে সেঁধিয়ে ঘটোৎকচ থোপা থোপা সেইসব

ফল ছিঁড়ে আনল। কারোই পেট ভরল না তাতে, তবে পিত্তদমন করা গেল।

বড়-সড় একটা শিমূল গাছের তলায় বসে সবাই জিরিয়ে নিচ্ছে। বনমালী আর তার স্যাঙাতরা জিরিয়ে নিতে গিয়ে ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘটোৎকচ গাছে উঠে চৌকি দিতে লাগল। মাধব একা বসে তাঁর জীবনটার কথা ভাবছিলেন। তাঁর ধারণা, বিষয়সম্পত্তি না থাকাতেই কেউ তাঁকে খাতির করে না। ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

আর দীর্ঘশ্বাসটার সঙ্গেই বেরিয়ে এল নন্দকিশোর। সেই বিঘত খানেক ধোঁয়াটে চেহারা। তার মধ্যেই চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "তুমি চোর নও বটে, কিন্তু খুব ভাল লোকও নও বাপু।"

মাধব ধমক দিয়ে বললেন, "এই আপনার দশ মিনিট?"

"তোমাদের দশ মিনিট আর আমাদের দশ মিনিট তো আর এক নয় বাপু। তাছাড়া ভিতরে বেশ নরম-গরম আবহাওয়া, একটু ঝিমুনিও এসে গিয়েছিল।"

"আমি তখন থেকে ভয়ে মরছি।"

নন্দকিশোর গম্ভীর মুখে বলে, "ভিতরে যা দেখলাম তা কহতব্য নয়। তুমি তো মহা পাজি লোক হে! একেই তো ভয়ঙ্কর রাগী, তার ওপর বাতিকগ্রস্ত, বুদ্ধিটাও বেশ ঘোলাটে, ধৈর্য সহ্য ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বলে কিছুই নেই তোমার। উন্নতি করার ইচ্ছেও তো দেখলাম না।"

এই সব গা-জ্বালানো কথায় কার না হাড়পিত্তি জ্বলে ওঠে? তদুপরি মাধবের ওপর দিয়ে একটা ঝড়ই তো যাচ্ছে! তিনি তেড়িয়া হয়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি!"

নন্দকিশোর খিক করে হেসে বলল, "কেন, আবার মারবে নাকি ?"

গত রাত্রির কথা ভেবে মাধব কিছু ধাতস্থ হয়ে বললেন, "আমার মায়াদয়া নেই একথা ঠিক নয়।"

নন্দকিশোর আবার খিক্ করে হাসে। তারপর বলে, "সে কথা থাক। তোমার ভিতরে ঢুকে আর-একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। ফোকলা মুখ দেখে তোমাকে আমি বুড়ো মানুষ ভেবেছিলাম, ভিতরে গিয়ে দেখলাম তুমি মোটেই বুড়ো নও, তরতাজা জোয়ান। তা দাঁতগুলো এই অল্পবয়সে খোয়ালে কী করে ? মাজতে না বুঝি। হুঁঃ, দাঁত ছিলো আমার। তোমার মতো বয়সে খাসির মাথা মুড়মুড় করে চিবিয়ে খেয়েছি, ঠিক যেমনভাবে লোকে মুড়ি খায়।"

মাধব বললেন, "আমার মতো আস্ত সুপুরি চিবিয়ে খেতে হলে বুঝতেন। দাঁতের কেরদানি বেরিয়ে যেত।"

"সুপুরি খেলে দাঁত পড়ে যায় এই প্রথম শুনলুম। সে যাকগে, তোমার ভিতরটা আমাকে আরো একটু ভাল করে দেখতে হবে।"

মাধব আঁতকে উঠে বললেন, "আবার ঢুকবেন নাকি ?"

"আলবত ঢুকব। তোমার মতো অপদার্থকে মানুষ করতে হলে বিস্তর মেহনত দিতে হয়। তোমার মগজটা তো দেখলাম শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে আছে। বুকের মধ্যে যে থলিটাতে সাহসের গুঁড়ো ভরা থাকে সেই থলিটা দেখলাম চুপসে আছে। অর্থাৎ, যতই তড়পাও, আসলে তুমি অতি কাপুরুষ লোক। চোখের বায়োস্কোপের পর্দাটাও বেশ ময়লা, অর্থাৎ তুমি দিনকানা রাতকানা মানুষ। চোখের সামনের জিনিসটা দেখেও দেখতে পাও না। এত যার অগুণ, তার আবার অত দেমাক কিসের ?"

মাধব মিনমিন করে বললেন, "এত সব কথা কেউ আমাকে কোনোদিন বলেনি।"

এইসময় হঠাৎ নন্দকিশোর একটু কেঁপে উঠে বলে, "একটা বিটকেল গন্ধ আসছে কোত্থেকে বলো তো? ভারী বিচ্ছিরি গন্ধ!"

বলতে না-বলতেই হঠাৎ গাছের মগডাল থেকে তরতর করে ঘটোৎকচ নেমে এল আর হুপহাপ করে লাফাতে লাগল।

নন্দকিশোর শিউরে উঠে 'ওরে বাবা' বলে চেঁচিয়ে পলকের মধ্যে মাধবের কানের ভিতরে ঢুকে গেল।

"করেন কী, করেন কী!" বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে মাধব কানে আঙুল ঢুকিয়ে বিস্তর খোঁচাখুঁচি করলেন। কিন্তু নন্দকিশোরের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। ভারী সুড়সুড় করছিল কানটা।

ঘটোৎকচের লাফালাফিতে বনমালী আর তার স্যাঙাতরা উঠে বসেছে। বনমালীর ইঙ্গিতে টিকটিকি-বিদ্যে-জানা লোকটা নিমেষে একটা শিশুগাছ বেয়ে মগডালে উঠে গেল, আবার সরসর করে নেমে এসে বলল, "ভীষণ বিপদ। অন্তত শ-দুই পুলিস নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে এদিকে আসছে।"

বনমালী চোখ কপালে তুলে বলে, "বলিস কী? আমাদের মতো ছিঁচকে চোর ধরতে এত পুলিস! মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিছু গুরুচরণ।"

মাধব ভয়ে কাঁপছিলেন। কানের মধ্যে নন্দকিশোর, পিছনে নবতারণ। বললেন, "তাহলে?"

বনমালী বলে, "কুছ পরোয়া নেই। এ হল হেতমগড়ের জঙ্গল। এর সব ঝোপঝাড়, গর্ত, খানাখন্দ আমাদের নখদর্পণে। এমন

জায়গায় গা ঢাকা দেব যে, দশ বছর খুঁজেও পুলিস আমাদের পাত্তা পাবে না।"

সামনের বেলে জমিতে অনেকখানি কাশবন। তারপর আরো গহিন জঙ্গল। কাশবন পেরিয়ে সবাই সেই গহিন জঙ্গলের ধারে পৌঁছে গেল। বনমালী বলল, "কর্তা, একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন।"

৫

বিজয়পুরের রায়বাহাদুর হেরম্ব রায় অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। অপদার্থ মাধব চৌধুরীর সঙ্গে ছোট মেয়ে ফুলির বিয়ে দেওয়ার পর থেকেই তাঁর মেজাজ খাট্টা হয়ে আছে। সত্য বটে হেতমগড়ের জমিদারদের একসময়ে খুব রবরবা ছিল, তাদের বংশও ভাল, বিজয়পুরের পাল্টি ঘর। দশ-বিশ বছর আগেও হেতমগড়ের চৌধুরী-বাড়িতে মেয়ে বা ছেলের বিয়ে দিতে পারলে যে-কেউ ধন্য হয়ে যেত। হেরম্ব রায় অবশ্য ধন্য হওয়ার লোক নন, কিন্তু তিনিও এই বিয়েতে খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর শালীদের ঠাট্টায় জামাইটা যে এমন আহাম্মুকির কাজ করবে তা জানবেন কী করে? শালীরা নাড়ুর মধ্যে সুপুরি দিয়েছিল। তা ওরকম তো শালীরা করেই থাকে। হেরম্ব রায়ের নিজের বিয়ের সময় তাঁর শালীরা পানের মধ্যে ধানী লঙ্কা দিয়েছিল, লুচির মধ্যে ন্যাকড়ার টুকরো ভরে দিয়েছিল, নুনগোলা শরবত খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল। তিনি কোনো ফাঁদে ধরা দেননি। কিন্তু তাঁর আহাম্মক ছোট জামাই বাহাদুরি দেখাতে আস্ত সুপুরি চিবিয়ে খেতে গিয়ে দাঁতগুলোর বারোটা বাজাল। খবর পেয়েছেন, জামাই এখন বাঁধানো দাঁত পরে থাকে। ছিঃ ছিঃ! একে তো ঐরকম গবেট, তার পর আবার আছে আঠারো আনা তেজ। বিয়ের পরদিনই শ্বশুরবাড়ির সংস্রব ছেড়ে চলে গেছে, আর ওমুখো

হয় না।

হেরম্ব রায় ভেবেছিলেন, ওরকম জামাইয়ের মুখদর্শন আর করবেন না। হেতমগড়ের সেই নামডাকও আর নেই। সরস্বতীর বানে বিষয়-সম্পত্তি সবই জলে গেছে। জামাইটা তার জমিদার ভগ্নীপতির গলগ্রহ হয়ে আছে। এমন জামাইকে জামাই বলে স্বীকার করতেও লজ্জা হয়।

কিন্তু বাদ সেধেছে ফুলি। এতকাল সে চুপচাপ ছিল বটে, কিন্তু হঠাৎ এক রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে, জামাই হতচ্ছাড়া নাকি একটা গ্যাস-বেলুন ধরে ঝুলে-ঝুলে আকাশ দিয়ে যাচ্ছে। এ-বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় নাকি সে বলে গেছে, "তিব্বতে সন্ন্যাসী হতে চললুম। আর ফিরব না।" সেই থেকে মেয়ে বেঁকে বসেছে, বাপের বাড়িতে আর থাকবে না। পাগল হোক, বোকা হোক, গলগ্রহ হোক, মাধবকে ফিরিয়ে আনতে হবে। দরকার হলে সে গাছতলাতেও থাকতে রাজি।

শুনে প্রথমটায় হেরম্ব ভীষণ চটে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ফুলি হেরম্ব রায়েরই মেয়ে তো। তেজ তারও কিছু কম নয়। সে সোজা গোটা দশেক করবী ফুলের বিচি আর একটা নতুন দড়ি নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে দোর দিয়েছে। দুদিন ধরে দরজা ঠায় বন্ধ। বাইরে থেকে মা পিসি মাসি কাকা ভাই বোনের কাকুতি-মিনতিতেও দরজা এতটুকু ফাঁক হয়নি। ফুলি বলে দিয়েছে, তিনদিনের মধ্যে ছোট জামাইকে সসম্মানে হাজির করা না হলে সে হয় বিষ খাবে, নয়তো গলায় দড়ি দেবে, কিংবা দুটোই একসঙ্গে করবে। সেই থেকে হেরম্ব আর বেশি কিছু বলার সাহস পাননি।

জামাইয়ের খোঁজে গতকাল তার ভগ্নীপতির বাড়িতে লাঠিয়াল

আর বরকন্দাজ পাঠিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসে খবর দিল, জামাই নাকি রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অগত্যা মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে তিনি চতুর্দিকে লোক-লশকর পাঠালেন। অবশেষে লাতনপুর থেকে লোকে এসে খবর দিল, ফুটবল খেলার মাঠে বন্দুক নিয়ে হামলা করার জন্য ছোট জামাইকে পুলিসে গ্রেফতার করেছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মাধবের অন্য যে-কোনো দোষ থাক সে যে এত বড় গুণ্ডা তা হেরম্বর জানা ছিল না। তবু খবরটা শুনে হেরম্ব তেমন দুঃখ পাননি। হাজতের ভাত খেয়ে আহাম্মকটার বুদ্ধিটা একটু খুলতে পারে। তাছাড়া থানায় আটক থাকলে আর যখন-তখন এদিক-সেদিক পালাতেও পারবে না।

কিন্তু কাল রাতে নায়েব এসে খবর দিল, জামাই আরো কয়েক-জন আসামীকে নিয়ে হাজত ভেঙে পালিয়েছে। এ-রকম বিপজ্জনক জামাই হেরম্বর আর একটিও নেই। কালে-কালে কত কী-ই যে হচ্ছে!

কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না। তাই তিনি জামাইকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কাল রাত বারোটার মধ্যে জামাইকে হাজির না করতে পারলে মেয়ে ফুলি আত্মঘাতী হবে কাজেই সময়ও আর হাতে নেই।

দশ হাজার টাকার লোভে পুলিস, গেরস্ত, চাষা, সবাই মাধবের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। সুতরাং জামাই ধরা পড়বেই।

হেরম্ব জামাইয়ের খবরের জন্য উদগ্রীব হয়ে দোতলার মস্ত বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। এই সময়ে তাঁর এক চর এসে খবর দিল, "রায়মশাই, আপনার জামাই হেতমগড়ের গভীর জঙ্গলে ঢুকেছেন। উদ্ধারের আশা খুবই কম। কারণ সেখানে চিতাবাঘ

ভালুক নেকড়ে বুনো মোষ অজগর, কী নেই! দিনে দুপুরে সেখানে ঘোর অন্ধকার। বিশাল বিশাল গাছ, লতাপাতা, বিছুটিবন, চোরা-বালি, দহ সবই সেখানে আছে।"

হেরম্ব বললেন, "কী সর্বনাশ! হেতমগড়ের জঙ্গল যে সর্বনেশে জায়গা! আমি পুরস্কার ডবল করে দিলাম। তোমরা সব বেরিয়ে পড়ো।"

শুনেই চররা বাঁই-বাঁই করে ছুটল।

হেতমগড়ের জঙ্গলে নবতারণ দারোগাও খবরটা শুনলেন। শুনেই কোমরবন্ধটা আরো একটু কষে এঁটে নিয়ে পঞ্চাশটা বৈঠকি আর পঞ্চাশটা বুকডন দিয়ে ফেললেন। সেপাইরা জঙ্গল ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে হেদিয়ে পড়েছিল, খবর শুনে তারাও চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ওদিকে প্রথম চোটে জঙ্গলে ঢুকেই মাধব জায়গাটার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, এমন বিচ্ছিরি গহন আর অন্ধকার জঙ্গল তিনি দেখেননি জীবনে।

সবার আগে বনমালী, তারপর রেলগাড়ির কামরার মতো এ ওর কোমর ধরে প্রথমে মাধব এবং বনমালীর স্যাঙাতরা। ঘটোৎ মাধবের কাঁধে উঠে বসে আছে।

বেশ যাচ্ছিল সবাই। এর মধ্যেই হঠাৎ পিছন থেকে খাউ-খাউ করে কুকুরগুলো তেড়ে এল। প্রাণের ভয়ে রেলগাড়ি ভেঙে যে যার মতো দৌড়োতে লাগল।

একটু বাদেই মাধব দেখেন, তাঁর সঙ্গীদের চিহ্নও নেই। ঘটোৎ-কচকে কাঁধে নিয়ে তিনি একা বেকুবের মতো ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। এই জঙ্গলে পুলিস তাঁকে খুঁজে পাবে না ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেও যে নিজেকে খুঁজে পাবেন মনে হচ্ছে না।

এই সময়ে হুপ করে ঘটোৎকচ কাঁধ থেকে নেমে মাধবের দিকে নিজের লেজটা বাড়িয়ে দিল। ইঙ্গিত বুঝে মাধব লেজটা তুহাতে চেপে ধরলেন।

ঘটোৎকচ শাল, শিশু, সেগুন, জিকা, বাবলা—হাজারো গাছ-গাছালি আর ঘন ঝোপঝাড় এবং লতাপাতার ভিতর দিয়ে মাধবকে নিয়ে চলল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা মাধব বুঝতে পারলেন না, তবে ঘটোৎ যে বুদ্ধি করে ঠিক জায়গাতেই তাকে নিয়ে তুলবে এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। তু-একবার লতায় পা জড়িয়ে আছাড় খেলেন মাধব। তবে ঘন ঝোপঝাড়ে পড়ে যাওয়ায় চোট পেলেন না। কাঁটা-গাছে লেগে গা তু-চার জায়গায় ছড়ে গেল। শুঁয়ো-পোকার হুল লেগে ঘাড়টা জ্বালা করতে লাগল। তবে এরকম ছোটখাটো বিপদ ছাড়া বড় কোনো অঘটন ঘটল না। জঙ্গলের জীব ঘটোৎকচ খুব সাবধানেই নিয়ে যেতে লাগল তাঁকে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও-কোথাও হঠাৎ গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদের দেখা পাওয়া যায়। কোথাও ঝিঁঝি ডাকে, তু-একবার হরিণের বিচ্ছিরি কাসির শব্দও পেলেন। কাসি নয়, ওটাই হরিণের ডাক। আশেপাশে বনমোরগেরাও থেকে থেকে ডাক দিয়ে জানান দিচ্ছে যে, এ জঙ্গলটা মানুষের জন্য নয়। পায়ের তলায় মাঝে-মাঝে কাদা জমি টের পাচ্ছেন মাধব, কখনো ভেজা গাছের পাতা জমে গালিচার মতো নরম বস্তুর ওপর আরামে পা ফেলছেন। এক জায়গায় একটা ঝর্নার জল বয়ে যাচ্ছে দেখে তু কোষ ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিলেন। কঁত করে একটা শ্বাস ফেলে ভাবলেন, এই জঙ্গলেরই কোথাও আমাদের বসতবাড়িটা ছিল।

আবার অন্ধকার জঙ্গলে ঢুকে চলেছেন তো চলেছেনই। পথ

আর ফুরোয় না। ঘটোৎকচেরও কি ক্লান্তি নেই? মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে লেজটা ছেড়ে দুহাতে জামা তুলে মুখ মুছে নিচ্ছেন। আবার শেষ অবলম্বনের মতো, শিবরাত্রির সলতের মতো লেজটা চেপে ধরছেন।

একসময়ে মাধবের মনে হল, লেজটা যেন কিছু মোটা মনে হচ্ছে! মনের ভুলই হবে। তবু লেজটা একটু হাতিয়ে দেখে নিলেন। সন্দেহটা থেকেই যাচ্ছে। লেজটা কিছু মোটাই।

আস্তে করে ডাকলেন, "ঘটোৎ! এই ঘটোৎ!"

ঘটোৎকচ সাধারণত হুপ বলে জবাব করে।

কিন্তু মাধব কোনো হুপ শুনতে পেলেন না।

ভয়ে-ভয়ে আবার ডাকলেন, "ঘটোৎ রে! বাবা ঘটোৎকচ!"

জবাব দিল না কেউ। কিন্তু দিব্যি সরসর করে টেনে নিয়ে চলল ঠিকই। নিকষ কালো একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছেন মাধব। বাইরে বোধহয় সন্ধেও হয়ে এল। তাই সামনে কিছুই নজরে পড়ছে না। মাধব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "কী খেয়ে হঠাৎ এত মোটা হয়ে গেলি বাপ ঘটোৎকচ!"

কেউ জবাব দিল না। তবে গতি অব্যাহত রইল।

হাঁটতে-হাঁটতে হয়রান হয়ে গেলেন মাধব। হঠাৎ টের পেলেন জঙ্গলটা যেন একটু পাতলা হয়ে আসছে। আকাশের দিকে তাকালে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দু-একটা তারার চিকিমিকি, একটু জ্যোৎস্নার মলম দেখা যায় যেন!

বড়-বড় গাছের সারি শেষ হয়ে হঠাৎই বেঁটে-বেঁটে ঝোপঝাড়ে পড়লেন মাধব। বেশ জোরেই যাচ্ছেন। তারপরই দেখেন, জ্যোৎস্নায় সামনে একটা জলা দেখা যাচ্ছে। জলার ধারে ধারে

মাঝে-মাঝে দপ-দপ করে মশালের মতো আলেয়ার আলো জ্বলে উঠছে। ঘটোৎকচও বেশ আস্তে চলছে এখন। একবার থেমেও পড়ল। হাঁফ ছেড়ে মাধব এতক্ষণে লেজটার দিকে তাকানোর ফুরসত পেলেন।

যা দেখলেন তাতে বেশ অবাকই হওয়ার কথা। ঘটোৎকচের লেজে কে বা কারা কালো আর হলুদ রঙ দিয়ে চিত্তির-বিচিত্তির করে দিয়েছে। ফলে লেজটা আর আগের মতো বিচ্ছিরি দেখতে নেই। বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে।

"বাঃ! বাঃ!" বলে মাধব লেজটায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোর সারা গা'টা এরকম চিত্তির-বিচিত্তির হলে দেখতে বেশ সুন্দর হয়ে উঠবি রে ঘটোৎ!"

বলতে-বলতে তিনি ঠাহর করে দেখেন, শুধু লেজ নয়, ঘটোৎকচের শরীরেও কালো আর হলুদ ছোপছক্কর দেখা যাচ্ছে! তবে বেঁটে গাছের জঙ্গলে শরীরের বারো আনাই ডুবে আছে বলে শুধু পিঠটাই দেখতে পেলেন মাধব।

মাধব খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ! বাঃ! তোকে যে আর চেনাই যায় না রে ঘটোৎ!"

বলতে না বলতেই বেঁটে ঝোপের আড়াল থেকে জলার ধারের ফাঁকা জমিতে পা দিলেন মাধব। জ্যোৎস্নায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে বিশাল জলাটাকে। চারধারে নিবিড় জঙ্গল। অল্প কুয়াশায় ভারী স্বপ্ন-স্বপ্ন দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড শীত যেন পাথর হয়ে জমে আছে এখানে।

এই শীতের হাঁটাহাঁটির পরিশ্রমে মাধবের কপালে ঘাম জমেছে। ঘটোৎকচের লেজে একটা টান মেরে মাধব বললেন, "একটু থাম বাবা ঘটোৎ। জিরিয়ে নিই।"



লেজে টান পড়ায় ঘটোৎ ঘর-র-র শব্দ করল। মাধব অবাক হলেন। চেহারার সঙ্গে-সঙ্গে কি ঘটোৎকচের স্বভাবটাও পাল্টে গেল! ঘটোৎ এরকম গম্ভীর আওয়াজ কখনো করে না তো!

ঘটোৎকচ একটু রেগেই গেছে। ঘর-র-র শব্দের পর ধীরে-ধীরে মুখটা ফিরিয়ে মাধবের দিকে তাকাল সে।

মাধব হিম হয়ে গেলেন। স্ট্যাচু হয়ে গেলেন। একটা আঙুলও নাড়বার ক্ষমতা রইল না আর।

ঘটোৎকচ ভেবে যার লেজ কষে ধরে আছেন, সেটা এক মস্ত চিতাবাঘ।

লেজটা ছেড়ে দিয়ে যে দৌড় দেবেন তারও উপায় নেই। আঙুল-গুলো লেজটাকে যেমন ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে ঠিক সেইভাবেই আড়ষ্ট হয়ে গেল। চেষ্টা করেও আঙুলের সেই বজ্র আঁটুনি খোলার উপায় নেই!

বাঘটা জুলজুল করে চেয়ে আছে। মাধবও চেয়ে আছেন। কেউ কারো চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না। বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধটা এখন বেশ নাকে আসছে মাধবের। কোনো ভুল নেই, সামনের জন্তুটা বাঘই বটে। জঙ্গলের অন্ধকারে কোন্ সময়ে যে লেজ-বদল হয়েছে তা টেরও পাননি মাধব।

কয়েক মিনিট সম্মোহিতের মতো থাকার পর মাধব গলার স্বর ফিরে পেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে অনেকদিনের পুরনো একটা ছড়ার লাইন বিড়-বিড় করে বলতে লাগলেন, "দোহাই দক্ষিণরায়, এই করো বাপা। অন্তিমে না পাই যেন চরণের থাপা॥"

ঠিক এই সময়ে মাধবের ডানদিকের কানটা ভারী সুড়সুড় করে উঠল। নন্দকিশোরের মুণ্ডুটা তাঁর ডান কানের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে

চারদিক দেখে নিয়ে বলে উঠল, "যাক বাবা! বাঁদরটা ধারে-কাছে নেই দেখছি। বাঁচালে!"

মাধব কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "বাঁদর না থাক, বাঘ তো আছে!"

নন্দকিশোর এক গাল হেসে বলল, "বাঘকে ভূতের কোনো পরোয়া নেই। বাঘের ব্যাপার তুমি বুঝবে।"

কাঁপতে-কাঁপতেই মাধব দাঁতে-দাঁতে ঠকাঠকের মধ্যে বললেন, "বাঁদরকেই কি আপনার সবচেয়ে ভয়?"

খিক-খিক করে একপেট হেসে নন্দকিশোর বলে, "গুপ্ত ব্যাপারটা ধরে ফেলেছ দেখছি। কী জানো, ঠিক ভয় নয়। বাঁদরের গায়ের একটা ভুটভুটে গন্ধ আছে, সেইটে আমাদের একদম সহ্য হয় না। তা তুমি দেখছি বেশ বাঘা লোক হে, এমনিতে ভিতু হলেও দিব্যি একটা বড়সড় বাঘকে পাকড়াও করেছ! চিড়িয়াখানায় বেচবে নাকি?"

"আজ্ঞে, ঠিক পাকড়াও করিনি। জঙ্গলে লেজবদল হয়ে গেছে। এখন ছাড়তে পারছি না। আঙুলগুলো জট পাকিয়ে আছে।"

"অ, তাই বলো! ভয়ে তোমার আঙুলে খিল লেগেছে! আমি তো নিজের চোখে ভিতরে ঢুকে দেখে এসেছি, তোমার সাহসের থলি চুপসে আছে। তাই বাঘের লেজ ধরে তোমার দাঁড়ানোর পোজ দেখে ভারী খটকা লাগছিল।"

ঠিক এই সময়ে বাঘটা বলল, ঘর-র-র···ঘ্যাও!

মাধব আপাদমস্তক আর একবার কেঁপে উঠলেন। এত কাছ থেকে এত জোরে বাঘের ডাক তিনি কোনোদিন শোনেননি। নন্দকিশোর তাঁর অবস্থা দেখে একটু নরম করে বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও,

দেখি কী করা যায়।"

এই বলে নন্দকিশোর আবার কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। মাধবের কান সুড়সুড় করে উঠল আবার। কিন্তু আঙুল দিয়ে কানের ফুটো যে একটু চুলকোবেন তার উপায় নেই। হাত দুটো বাঘের লেজে সেঁটে আছে।

একটু বাদে হঠাৎ মাধব যেন একটু সাহস পেতে লাগলেন। আর যেন ততটা ভয় করছিল না। বাঘটা যদিও তাঁকে জলার দিকে ধীরে-ধীরে টেনে নিয়ে যেতে-যেতে মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখছে আর লকলকে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে, তবু মাধবের যেন একটু বেপরোয়া ভাব এল। হাত দুটোও যেন ক্রমে বাঘের লেজ থেকে খসে আসছে।

নন্দকিশোর এবার নাকের ফুটো দিয়ে উঁকি দেওয়ায় মাধব বার-দুই প্রকাণ্ড হ্যাঁচ্চো দিয়ে বললেন, "কী হল?"

নন্দকিশোর চোখ পাকিয়ে বলল, "আচ্ছা অভদ্র তো হে! আমার গায়ের ওপর হেঁচে দিলে?"

মাধব ক্ষমা চেয়ে বললেন, "নাকে সুড়সুড়ি লাগল কিনা।"

নন্দকিশোর ক্ষমা করে দিয়ে বলল, "কোনো রকমে তোমার সাহসের থলিটাকে ফুঁ দিয়ে বেলুনের মতো ফুলিয়ে একটা শিরা দিয়ে বেঁধে দিয়ে এসেছি। সেটাতে তেমন কোনো স্থায়ী কাজ হবে না বটে, তবে চোপসানো থলির চেয়ে তা অনেক ভাল। আপাতত এইতেই কাজ চালিয়ে নাও। আমি আবার ভিতরে চললুম, সেখানে আমার অনেক কাজ।"

মাধব আর আগের মতো ভিতু নন, তাই গম্ভীর গলায় বললেন, "কী কাজ?"

"তোমার শুকনো মগজটাকে জল ছিটিয়ে একটু সরস করে তুলতে হবে। রাগের ঝালগুঁড়োগুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে। মায়া দয়া স্নেহ মমতার কয়েকটা চারাগাছ পুঁতে দিতে হবে। তারপর যদি একটু মানুষের মতো মানুষ হও।"

এই বলে নন্দকিশোর আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

জলার কাদামাটিতে মাধবের হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছিল ভুসভুস করে। আর একটু এগোলেই কোমর পর্যন্ত ডুববে। তাহলে আর কাদার কবর থেকে জীবনেও উঠে আসতে পারবেন না। বাঘের সে ভয় নেই, চারপায়ে দিব্যি হালকা-পলকা চালে চলে যাচ্ছে নরম মাটির ওপর দিয়ে।

মাধব দম বন্ধ করে প্রাণপণে এক ঝটকা মারলেন। হাত দুটো ঝড়াস করে খুলে দুটো লাঠির মতো শরীরের দুধারে ঝুলতে লাগল। একেবারে অবশ।

শিকার পালাচ্ছে বুঝে বাঘটাও থামল এবং আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ঘর-র-র···ঘ্যাও।

মাধবও চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, "মামদোবাজি পেয়েছ? কাদায় ডুবিয়ে মারবে! এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দেব!" বলে চড়ও তুললেন। কিন্তু বাঘটা মুখ সরিয়ে নেওয়ায় চড়টা লাগল না! কিন্তু একটা খুব উপকার হল মাধবের। হাতের অবশ ভাবটা কেটে গেল।

মাধব দেখলেন বাঘটা আর ঝামেলা না বাড়িয়ে জলার দিকে জল খেতে গেল। তিনিও হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ঠাণ্ডা কাদা ভেঙে ডাঙা জমিতে উঠে এসে একটা শুকনো জায়গায় মস্ত একটা গাছ পড়ে আছে দেখে তার ওপর বসলেন। ক্লান্তিতে হাত-পা অবশ করে চোখ

জড়িয়ে আসছে। এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে পারে তা মনে করেও কিছুতেই জেগে থাকতে পারছেন না। চোখের পাতা দুটো এত জুড়ে যাচ্ছে যে, আঙুল দিয়ে টেনে খুলে রাখতে হচ্ছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলেন, চিতাবাঘটা জলায় জল খাচ্ছে। তার আশে-পাশে জলার অন্য ধারগুলিতে তিনি আরও কয়েকটি প্রাণীকে দেখতে পেলেন। একজোড়া মোষ, একটা ভালুক, গোটা কয়েক মস্ত শম্বর হরিণ। কিন্তু ঠিক আগের মতো আর ভয় পাচ্ছেন না। নন্দকিশোর সাহসের থলিটা ভালই ফুলিয়েছে বলতে হবে। এখন যদি লিক-টিক না বেরোয় তবেই বাঁচোয়া।

মাধব গাছের গুড়িটার পাশেই লম্বা হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল বেলায় সূর্য যখন উঠি-উঠি করছে তখন ঘুম ভাঙল মাধবের। এই শীতে সারা রাত বেশ ওমের মধ্যেই শুয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। গায়ে যেন একটা ভারী কম্বল ছিল! জেগে উঠে পাশ ফিরতে গিয়েই অবাক হয়ে দেখলেন, মস্ত চিতাবাঘটা তাঁকে আঁকড়ে ধরে গা ঘেঁষে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

অন্য সময়ে হলে এই দৃশ্য দেখে মাধবের হার্টফেল হত। এখন হল না। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন মাত্র। কোমর আর গলা থেকে বাঘের দুটো থাবা আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন মাধব। তারপর রোজকার মতো হাই তুলে বললেন, "দুর্গা দুর্গা।"

দিনের আলোয় দেখলেন, জলার ধারে বিস্তর বড়-বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সাবধানে সেগুলোর ওপর পা ফেলে জলায় গিয়ে মুখ ধুলেন। ফিরে এসে আবার অকুতোভয়ে বাঘটার মাথার কাছে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলেন।

বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, সামনের পাথরের চাঁইগুলো কেমন যেন চৌকো ধরনের। মনে হয় বহু পুরনো কোনো বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ধ্বংসাবশেষ। তারপরেই মাধবের নজর পড়ল গাছের গুঁড়িটার দিকে। ওপরে শ্যাওলা জমে আছে। মাধবের সন্দেহ হওয়াতে নখ দিয়ে খুঁটলেন এবং দেখলেন, এটা মোটেই গাছের গুঁড়ি নয়। একটা প্রাচীন থাম। মাধব একটু চমকে উঠলেন। এ-সবের মানে কী? চারদিকে চেয়ে এ-জায়গাটা তাঁর চেনা-চেনা ঠেকছে। দৈবক্রমে হেতমগড়ের হারানো বাড়িতে ফিরে আসেননি তো?

এই কথা মাত্র ভেবেছেন, হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বাজ-পড়ার মতো 'ঘ্রাম' করে গর্জন ছাড়ল বাঘটা। ঘুম থেকে উঠে কপিশ চোখে সোজা তাকিয়ে আছে মাধবের দিকে।

বুকটা কেঁপে ওঠায় মাধব প্রথমটায় ককিয়ে উঠেছিলেন। হয়তো অজ্ঞানও হয়ে যেতেন। কিন্তু হঠাৎ নাকের ফুটো দিয়ে নন্দকিশোর মুখ বার করে বলল, "বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে হে। একটু ঘুমোতেও দেবে না নাকি?"

"আমি চেঁচাইনি। চেঁচাল তো ঐ বাঘটা।" মাধব বললেন।

নন্দকিশোর বাঘটার দিকে বিরক্তির দৃষ্টি হেনে বলল, "লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। পালাও।"

"কোথায় পালাব?"

"সে আমি কী জানি! আমাকে তো আর বাঘে খাবে না। খেলে তোমাকেই খাবে। ঐ যে আসছে!" বলে নন্দকিশোর আবার নাকের ফুটো বেয়ে সুট করে মাধবের ভিতরে ঢুকে যায়।

বাঘটা সত্যিই পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। খুবই নিশ্চিন্ত ভাব-

ভঙ্গি। একবার প্রকাণ্ড একটা হাইও তুলল। মাধব ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, সারা রাত বাগে পেয়েও যখন বাঘে তাকে খায়নি, তখন এই সাত-সকালেও বোধহয় খাবে না। তাছাড়া চিতাবাঘ সাধারণত মানুষ খায়ও না, কিন্তু বেগরবাঁই দেখলে মারে। এই বাঘটার ব্রেকফাস্ট হয়েছে কিনা তা বুঝতে না-পারায় মাধব খুব নিশ্চিন্তও বোধ করতে পারছেন না।

বাঘটা এসে মাধবের সামনে থাবা গেড়ে বসল এবং খুব মন দিয়ে মাধবের মুখখানা দেখতে লাগল। তাতে খানিকটা ভয় কেটে গিয়ে মাধবের একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল। কারণ, আজ দাড়ি কামানো হয়নি। কাল থেকে নানা ঘটনায় নাকাল হয়ে চেহারাটা হয়েছে ঝোড়ো কাকের মতো। তার ওপর দাঁত নেই। চুলটা ঠিক মতো পাট করা নেই। মাধব বাঘের দৃষ্টির সামনে লজ্জায় অধোবদন হয়ে বসে রইলেন।

বাঘটা এবার মোলায়েম গলায় বলল, ড্রাম!

মোলায়েম হলেও এই আওয়াজেও পিলে চমকে যায়। মাধবেরও চমকাল।

বাঘটা একটু ঘুরে বসে আচমকাই লেজটা মাধবের কোলের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ঘর্-র!

মাধব আঁতকে উঠলেন। অমনি নন্দকিশোর কানে কানে বলল, “তোমাকে লেজটা ধরতে বলছে।”

“ধরব?” মাধব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

“না-ধরেই বা কী করবে?”

“তাই তো!” বলে মাধব খুব সংকোচের সঙ্গে লেজটা ধরলেন। বাঘটা তখন ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে নিয়ে চলল।

পুবধার দিয়ে জলাটা ঘুরে বাঘটা তাঁকে একটা ভারী সুন্দর সাজানো জঙ্গলে নিয়ে এল। মনে হয়, এখানে এককালে মস্ত কোনো বাগান ছিল। হাঁ করে চারদিকে চেয়ে দেখছেন মাধব। বাগানের চারধারে কোনো পাঁচিলের চিহ্নও নেই। তবে একটা জায়গায় একটা মস্ত গোল বাঁধানো চৌবাচ্চার আকৃতি মাটির মধ্যে দেখতে পেলেন। খুবই চেনা-চেনা ঠেকছে।

বাঘটা একটা হ্যাঁচকা টানে লেজ ছাড়িয়ে নিয়েছে। তারপর একটা বেঁটে জামগাছের দিকে এগোচ্ছে তুলকি চালে। মাধব বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে দেখছেন।

জামগাছের নিচু ডালে মস্ত বড় একটা মৌচাক। বিজবিজ করছে মৌমাছি। বাঘটা গিয়ে এক লাফে গাছের ডালে উঠে ধীরে ধীরে চাকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাধব দম বন্ধ করে আছেন। আচমকা নাড়া পড়লে মৌমাছিরা যে কী কাণ্ড ঘটাবে!

কিন্তু বাঘটার বুদ্ধির প্রশংসাই করতে হয়। হুট করে কোনো কাণ্ড ঘটাল না। বরং খুব ধীরে ধীরে সামনের পা দুটো দিয়ে ডালটাকে নাড়াতে লাগল। যেন বাতাসের দোলা। একটি দুটি করে মৌমাছি চাক থেকে উড়ে যেতে লাগল। বাঘটা আস্তে-আস্তে দুলুনি বাড়াতে থাকে। মাঝে মাঝে আচমকা একটু ঝাঁকুনি দেয়। মৌমাছিরা পালাচ্ছে। উড়ছে, ফিরে আসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় চাকটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। মাধব দূর থেকেও দেখতে পেলেন, টসটস করছে মধু।

বাঘটা বলল, ঘ্রাও!

নন্দকিশোর সঙ্গে-সঙ্গে কানে-কানে কথাটা অনুবাদ করে বলল, "তোমাকে খেতে বলছে। শুনলে না, খাও!"

"খাব ?"

"না খেয়েই বা করবে কী ? বাঘকে চটানো কি ভাল ? বাঘটাকে খুব ভাল বাগিয়েছ হে !"

বাঘটা চাকটাকে মৌমাছিশূন্য করে আর দাঁড়াল না। জঙ্গলের মধ্যে বোধহয় হরিণের গন্ধ পেয়েই এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাধব নিশ্চিন্তে এগিয়ে গিয়ে চাকটার নীচে দাঁড়ালেন। হাতের নাগালের মধ্যে একেবারে নাকের ডগায় জিনিসটা ঝুলে আছে। মাধব আর দেরি না করে চাকটার খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুঠোয় চাপ দিয়ে সেরটাক রস বের করে খেয়ে ফেললেন। বহুকাল এরকম ভাল পদ্মমধু খাননি। প্রাণ বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তারপর চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

যত দেখেন ততই ধারণা হতে থাকে, এ সেই হেতমগড়ের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ না হয়ে যায় না। এক জায়গায় তিনি বেশ কয়েকটা বড় বড় শ্বেতপাথরের টুকরো দেখতে পেলেন। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা পেতলের কলসির গায়ে দেখলেন নাম খোদাই করা—আর. সি.। সম্ভবত তাঁর বাবার নামের আদ্যক্ষর। বাবার একটাই ছিল শখ। সব কিছুতে নিজের নামের আদ্যক্ষর খোদাই করতেন। সুতরাং মাধবের আর সন্দেহ রইল না, দৈবক্রমে নিজেদের হারানো ভিটের সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

অবশ্য সন্ধান পেয়েও কোনো লাভ নেই। এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে মাটিতে প্রায় মিশে-যাওয়া বাড়ি নিয়ে তিনি করবেনই বা কী ? বাড়িতে কিছু গুপ্তধন আছে বলে শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাপ-ঠাকুরদা সেই গুপ্তধনের অনেক খোঁজ করেও সন্ধান পাননি। এখন সেই গুপ্তধনের সন্ধান করার কাজ বরং আরও কঠিন হয়েছে। কেননা,

পুরো বাড়িটাই ডেবে গেছে মাটির নীচে।

মাধব তাই আরও সেরটাক মধু খেয়ে গাছতলায় ছায়ায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলেন। মধু খাওয়ার আমেজে ঘুমও এসে গেল। তাই ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর রাগী ঠাকুরদা গাছের ওপর বসে আছেন রাগের চোটে। রাগে গরগর করছেন। ঐ ভাবে গাছের ওপর বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ তাঁর লেজ গজিয়ে গেল। রেগে গেলে মুখটা সবসময়ে কুঁচকে আছেন বলে ক্রমে-ক্রমে মুখটা বদলে যেতে লাগল। ক্রমে সেটা হুবহু বাঁদরের মুখের মতো দেখাতে লাগল। গায়ে লোম গজাল। মাধব দেখলেন, ঠাকুর্দার বদলে একটা মহাবানর গাছের ডালে বসে আছে। তারপরই দেখতে পেলেন বাবাকে। মাধবের বাবা রাগের চোটে কাকে যেন হুংকার দিয়ে ডেকে তর্জন-গর্জন করলেন। পারলে তাকে দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফেলেন আর কী! চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে, হাঁ করে থাকায় দাঁতগুলো হিংস্র দেখাচ্ছে। জিবটাও লকলক করছে যেন। নিজের বীভৎস রাগকে বশে আনার জন্য কলকে পুড়িয়ে ছ্যাকা দিচ্ছেন নিজের গায়ে। এই করতে-করতে সারা শরীরে ছোপ-ছোপ দাগ হয়ে গেল। চোখ দুটো গোল গোল আর কপিশ রঙের হয়ে গেল। দাঁতগুলো বড় বড় আর ধারালো হয়ে উঠল। ক্রনে দেখা গেল, মাধবের বাবা রাগের চোটে আস্ত একটা বাঘ হয়ে বিকট গর্জন ছাড়লেন, হ্রাম!

সে গর্জনে ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন মাধব। দেখলেন, বাঘটা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আবেগের চোটে মাধব ডুকরে কেঁদে উঠলেন, “বাবা!”

বাঘ জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে ছিল বটে, তবে চোখে তেমন

হিংস্রতা নেই। ঘপাস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বাঘটা বলে উঠল, গিয়াও।

কানের কাছে নন্দকিশোর ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে উঠে পড়তে বলছে।"

মাধব হাতের পিঠে চোখের জল মুছতে-মুছতে উঠলেন। বাঘটা লেজ বাড়িয়ে ধরল। মাধব সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে হাঁটতে লাগলেন পিছু-পিছু।

জলার উত্তরধারের দুর্ভেদ্য ভয়ংকর কাঁটাঝোপের জঙ্গল, আগাছা ভেদ করে ও পায়ের নীচে ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে বাঘটা তাঁকে একটা মজা পুরনো ইঁদারার ধারে নিয়ে এল। মাধবের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় এই ইঁদারাটাকে তিনি দেখেছেন। এর জল পচা ছিল বলে কেউ ব্যবহার করত না। সবাই বলত, ওর মধ্যে ভূত আছে। মাঝে-মাঝে নাকি ভুতুড়ে ইঁদারার ভেতর থেকে নানারকম আওয়াজ উঠে আসত। অনেক সময়ে মানুষের গলায় কান্নার শব্দ পাওয়া যেত। নিশুত রাতে ঘুম ভেঙে বাড়ির দাসী-চাকরেরা শুনতে পেত, ইঁদারার ভিতর থেকে শব্দ আসছে, আয়, আয়, আয় আয়।

বাঘটা ইঁদারার কাছে এসে মাধবের দিকে চেয়ে ডাকল, ঘর-র গ্রাও!

ঠিক এইসময়ে একপাল হরিণ পথ ভুলে সামনে এসে পড়েছিল। বাঘ দেখে হাওয়ার গতিতে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মাধবের হাত থেকে লেজটা টেনে নিয়ে বাঘও হাওয়া। মাধব চোখের জল মুছে আপন মনে বললেন, বাবার খিদে পেয়েছে।

"খিদে পেয়েছে না হাতি! বাঘ হচ্ছে এক নম্বরের পেটুক। যখন তখন তাদের খাই-খাই। ও হচ্ছে চোখের খিদে।" বলতে-বলতে

নন্দকিশোর মাধবের নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে সাঁতার কাটতে লাগল।

মাধব খেপে গিয়ে বললেন, "খবর্দার! আজে-বাজে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি! ভাল হবে না।"

"এঃ! খুব যে তেজ দেখছি! কী করবে-টা শুনি! তোমার মতো অকৃতজ্ঞ লোক দুটো দেখিনি। সারা সকাল ধরে তোমার ফোকলা নাম ঘোচানোর জন্য কত মেহনত করলুম, এই তার প্রতিদান?"

মাধব রাগটা চেপে রেখে বললেন, "কী করেছেন শুনি!"

"তোমার মাড়ির গোড়া সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে দাঁতের বীজ বুনেছি। একটু সার আর জল পেলে দেখ-না-দেখ দাঁতের চারা গজিয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি বাপু মহা অকৃতজ্ঞ।"

মাধব লজ্জিত হয়ে বললেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন!"

"না করে আর উপায় কী? যাই, একটু বেরিয়ে আসি। বাঘটা তোমাকে কী বলে গেল বুঝেছ তো!"

"আজ্ঞে না।"

"বাঘটা তোমাকে ওই কুয়োটার মধ্যে নেমে পড়তে বলে গেছে। ভালমন্দ তুমি বোঝো গিয়ে, আমি শুধু অনুবাদটা করে দিলাম।"

এই বলে নন্দকিশোর ফড়ফড় করে বাতাসে ভেসে চলে গেল।

মাধব ইঁদারার মধ্যে ঝুঁকে দেখলেন, একেবারে তলায় একটু জল এখনো চকচক করছে। ইঁদারায় নামবার কোনো সিঁড়ি বা মই নেই। তবে ভিতরে হরেক রকম ভাঙাচোরা থাকায় নানা ধরনের খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শ্যাওলা জমে খাঁজগুলো ভীষণ পিছল। মাধব তাই নামতে সাহস পেলেন না। চুপ করে ইঁদারার ধারে গাছের ছায়ায় বসে রইলেন। বুঝতে পারছেন, ইঁদারার মধ্যে কোনো রহস্য

আছে। স্বয়ং বাঘবেশী বাবা নাহলে এখানে তাঁকে টেনে আনতেন না।

ভাবতে-ভাবতে মাধবের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। বেলা ঢলে আসছে। শীতকালে এই জঙ্গলে দুপুর না গড়াতেই রাত্রি এসে যাবে। কী করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না মাধব। ঝিমোতে-ঝিমোতে নানা কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ মাথার ওপর 'হুপ হুপ' করে দুটো শব্দ হল। তারপরই ডালপালা তছনছ করে বিকট উল্লাসের শব্দ করতে করতে ঘটোৎকচ নেমে এল মাধবের কোলের ওপর। আর অমনি জঙ্গলের ভিতর থেকে বনমালীর গলা পাওয়া গেল, "কর্তা ধারেকাছে আছেন নাকি ?"

"আছি! আছি!" চেঁচিয়ে উঠলেন মাধব। তারপর ঘটোৎকচকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দাদু! দাদু গো! এ-জন্মেও আমাকে ভোলোনি তাহলে!"

জঙ্গল ফুঁড়ে খিদেয় চিমড়ে-মারা চারটে মূর্তি বেরিয়ে এসে ধপাস-ধপাস করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মাধবের ভারী মায়া হল। বললেন, "বোসো তোমরা, ব্যবস্থা আছে।

জায়গাটা এখন চেনা হয়ে গেছে। মাধব গিয়ে জামগাছের ডাল থেকে মৌচাকটা পুরো ভেঙে আনলেন। মধুতে এখনো ভরা-ভর্তি। টপটপ করে মধুর ফোঁটা পড়ে চাকের নীচে মাটি ভিজে গেছে, পিঁপড়ে লেগেছে।

চাক নিয়ে এসে চারজনকে আকণ্ঠ মধু খাওয়ালেন মাধব। সকলের পেট ঠাণ্ডা হল, গায়ে জোর বল এল।

মুখে কথা ফোটার মতো অবস্থা হতেই বনমালী বলে উঠল, "কর্তা! এ জায়গাটা যে বড় চেনা-চেনা ঠেকছে!"

মাধব তখন গোটা ব্যাপারটাই ভেঙে বললেন। সবাই শুনে তাজ্জব হয়ে গেল। বনমালী তার টিকটিকি-বিদ্যে-জানা স্যাঙাতকে হুকুম দিল, "ইঁদারায় নাম।"

লোকটা কালবিলম্ব না করে তরতর করে ইঁদারার ভিতরের খাঁজে পা আর হাতের ভর রেখে শাঁ করে নেমে গেল। ওপর থেকে সবাই ঝুঁকে দেখছে, লোকটা জলের কাছ-বরাবর নেমে চারদিকে গুপ্ত দরজা বা গর্ত খুঁজছে। অনেকক্ষণ খুঁজল। তারপর কিছু না পেয়ে ওপর দিকে চেয়ে বনমালীর উদ্দেশে বলল, "ওস্তাদ, এখানে তো কিছু দেখছি না।"

ঘটোৎকচ কী বুঝল কে জানে। হঠাৎ সে 'হুপ' করে হাঁক ছেড়ে ইঁদারার মধ্যে সাবধানে নামতে লাগল। আধাআধি নেমে একটা পাথরের চাঁই ধরে টানাটানি করতে করতে চেঁচাতে লাগল, হুপ! হুপ!

তখন টিকটিকি-ওস্তাদ নীচে থেকে ঘটোৎকচের কাছ-বরাবর উঠে এসে পাথরটা ভাল করে দেখে-টেখে বলল, "এ পাথরটা একটু অন্যরকম।"

বেলা ফুরিয়ে আসছে। জঙ্গলের প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীতও মালুম দিচ্ছে। বনমালী আর দেরি না করে তার আর-দুই স্যাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে লম্বা-লম্বা কয়েকটা লতানে গাছ ছিঁড়ে আনল। কাছেই একটা মস্ত গাছের গুঁড়িতে লতার এক মাথা বেঁধে অন্য মাথা ঝুলিয়ে দিল ইঁদারার মধ্যে। তারপর একে একে বনমালী আর তার এক স্যাঙাত নেমে গেল নীচে।

তিনজন মিলে পাথরটার ওপর কী ক্রিয়া-কৌশল করল, ওপর থেকে মাধব তা ভাল বুঝলেন না। তবে কিছুক্ষণ বাদে দেখতে পেলেন

পাথরটা দরজার কপাটের মতো খুলে গেছে! বনমালী চেঁচিয়ে বলল, "কর্তা, ঝুল খেয়ে নেমে আসুন। এখানে একটা সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে।"

উৎসাহের চোটে মাধবের আর ভয়ডর রইল না। লতা বেয়ে নেমে গিয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ হাঁ করে আছে। স্যাঙাতদের একজনের কাছে দেশলাই ছিল। তাই দিয়ে মৌচাকটাতে আগুন দেওয়ায় দিব্যি আলো জ্বলে উঠল। একটা গাছের ডালের আগায় জ্বলন্ত মৌচাকটাকে গেঁথে নিয়ে মাধব সদলে সুড়ঙ্গে ঢুকলেন। এত নিচু আর সরু সুড়ঙ্গ যে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। ভিতরে বদ্ধ ভ্যাপসা ভাব। চারদিকে নিরেট পাথরের দেয়াল। মশালের আগুন আর ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়।

খানিকদূর গিয়ে সুড়ঙ্গটা কিছু চওড়া হল। ছাদটাও একটু উঁচুতে। সামনে গলিটা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। সেইখানে সবাই দু'দণ্ড জিরিয়ে হাঁফ ছাড়ে। বনমালী বলল, "কর্তা, আমরা ছ্যাঁচড়া হলেও নিমকহারাম নই, চোর হলেও লোভী নই। যদি গুপ্তধন পাওয়া যায় তবে সবটাই আপনার। আপনি আবার হেতমগড় গাঁ তৈরি করুন! আমাদের শুধু সেখানে থাকতে দেবেন। কথা দিচ্ছি, হেতমগড়ে কখনো চুরি-ডাকাতি হবে না!"

মাধব রাজি হলেন। সেখানেই ঠিক হল, মাধব বনমালী আর ঘটোৎকচকে নিয়ে যাবেন ডাইনে, তিন স্যাঙাত যাবে বাঁয়ে। ঘণ্টা দুই পর তারা আবার এখানে ফিরে আসবে। মৌচাক ভেঙে দুটো মশাল তৈরি করে তাঁরা দুদিকে এগোলেন।

মাধব ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোচ্ছেন। সামনে ঘটোৎকচ



পিছনে বনমালী। চারদিকে পাথরের দেয়াল চলেছে তো চলেইছে। মাথা নিচু না করে যাওয়ার উপায় নেই। মাধবের ঘাড় টনটন করে ছিঁড়ে পড়ার জোগাড়। তার ওপর এই শীতকালেও সুড়ঙ্গের ভিতরটায় বেজায় ভ্যাপসা গরম। অনেকক্ষণ চলার পর মাধব হঠাৎ বুঝলেন, সুড়ঙ্গটা হচ্ছে আসলে একটা ভুলভুলাইয়া বা গোলকধাঁধা। কোনোখানেই পৌঁছচ্ছেন না, কেবলই যেন একই জায়গায় ঘুরে মরছেন।

খুবই ক্লান্ত হয়ে একসময়ে পাথরে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন মাধব। পাশে বনমালী আর ঘটোৎকচ।

মুখে কথা পর্যন্ত সরছে না কারো। ঠিক এই সময়ে মাধব শুনতে পেলেন, নন্দকিশোর কানে-কানে বলছে, "খুব কানামাছি খেললে বাপু! তা আমাকে যে ফেলে এলে, আমি কি তোমার গুপ্তধনে ভাগ বসাতুম?"

মাধব গম্ভীর মুখে বললেন, "আপনার মতো অপদার্থ ভূত জীবনে দেখিনি।"

"বেশি কচকচ কোরো না ছোকরা। তোমার ঐ বাঁদরটার গায়ের গন্ধ আমার যদি অসহ্য না হত তাহলে আজ তোমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে বিস্তর নাকাল করতুম। যাক গে, এখন হাঁ করো তো, ভিতরে সেঁদিয়ে যাই।"

বনমালী হাঁ করে মাধবের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, "ও কার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি? এখানে তো আমি ছাড়া আর কোনো মনিষ্যি নেই।"

মাধব সেকথার জবাব না দিয়ে নন্দকিশোরকে বললেন, "অপকার সবাই করতে পারে। উপকারটাই করতে পারে না। এই যে

গোলকধাঁধায় পড়ে খাবি খাচ্ছি, তার একটা উদ্ধারের পথ আগে বের করে দিন, তারপর বড়-বড় কথা বলবেন। প্রথম থেকেই তো ফাঁড়া কাটছেন, ভূত এটা পারে না, সেটা পারে না। ও কেমনধারা কথা!"

নন্দকিশোর চিড়বিড়িয়ে উঠে বলল, "কভি নেহি! কভি নেহি! মানুষের উপকার আর কক্ষনো নয়। তুমি নিতান্ত হাবা-গঙ্গারাম বলে আর মানুষের মতো মানুষ নও বলে তোমার খানিকটা উপকার করে ফেলেছি। এখন দেখছি তুমিও খুব সেয়ানা। আর উপকারের মধ্যে আমি নেই। বেঁচে থাকতে বিস্তর মানুষের উপকার করেছি। ফলে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়েছিল। ফের উপকার করতে গিয়ে ফেঁসে যাব নাকি! তার ওপর এখন গলায় দড়ি দিয়ে মরবারও উপায় নেই।"

এই বলে নন্দকিশোর গোঁত্তা খেয়ে মাধবের মুখে ঢুকে পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

বনমালী ভাবল, কর্তাকে ভূতে ধরেছে। এই সুড়ঙ্গের ঘোর অন্ধকার পাতালপুরীতে সেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাছাড়া গুপ্ত-ধনের কাছেপিঠে এঁরা থাকেই। বনমালী হঠাৎ ভয় খেয়ে শিউরে উঠে 'ভূত! ভূত!' বলে চেঁচিয়ে দৌড়তে লাগল।

কিন্তু এই পাতালপুরীতে দৌড়ে যাবে কোথায়? দশ কদম যেতে না-যেতেই একটা দেয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়ায় 'উঃ' বলে বসে পড়ল। আর বসেই চেঁচিয়ে উঠল, "কর্তা, এধারে আসুন তো।"

মশাল নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। মৌচাকে আর মোম নেই। সাবধানে মাধব এগিয়ে গেলেন। বনমালী বলল, "এই পাথরটা যেন আমার ধাক্কায় একটু নড়ে উঠল। দেখুন তো।"

কথাটা সত্যি। পাথরটা একটু ঠেলতেই নড়ল। এবং টানতেই কপাটের মতো খুলে গেল।

মাধব মশালের শেষ আলোটুকুতে মুখ ঢুকিয়ে দেখলেন, ভিতরে একটা ঘর। ঘরে অনেক জিনিস রয়েছে। মাধব ঘরে ঢুকলেন।

সামনেই একটা পিলসুজে মস্ত প্রদীপ রয়েছে। মাধবের বুদ্ধি খেলছে। বুঝলেন, প্রদীপ আছে, তখন খুঁজলে তেলও পাওয়া যাবে।

বেশি খুঁজতে হল না। পুরনো একটা গাড়ুতে বিস্তর রেড়ির তেল পাওয়া গেল। নিবন্ত মশাল দিয়ে প্রদীপটা একেবারে শেষ মুহূর্তে জ্বালাতে পারলেন মাধব। সেই আলোয় চারদিকে চেয়ে একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেললেন। সেই হারানো মোহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর দুঃখের কিছু নেই।

মাধব আস্তে আস্তে গিয়ে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকটার গায়ে হাত বোলালেন। প্রদীপের আলোয় দেখলেন, সিন্দুকের গায়ে খোদাই করে লেখা : এই সম্পদ ভোগের জন্য নহে। ইহার দ্বারা প্রজাপালন, কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন, সড়ক প্রভৃতি নির্মাণ করিবে। বিদ্যা ও ধর্ম দান করিবে। সতত অপরের মঙ্গল চিন্তা না করিলে এই সম্পদে অধিকার জন্মায় না, ইহা জানিও। সর্বদাই চিন্তা করিবে : আমি অক্রোধী, আমি অনামী, আমি নিরলস, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু…



নবতারণ পথেই খবর পাচ্ছেন, বিজয়পুরের জমিদারমশাই মাধবের সন্ধানের জন্য পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজারে উঠেছেন।

সুতরাং নবতারণ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু হেতমগড়ের পাজি জঙ্গলও কিছু কম যায় না। অত সেপাই লোকলশকর সবই যেন ক্রমে-ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

নবতারণের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিল ভজহরি আর পুঁটিরাম। কিন্তু একসময়ে তারাও তাল রাখতে পারল না। নবতারণ সন্ধের মুখে-মুখে দেখলেন, তিনি ভয়াবহ জঙ্গলটায় একেবারে একা। ওদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পথের চিহ্নও নেই। ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠেছে।

ক্লান্ত নবতারণ একটা জলার ধারে ঘোড়া থামালেন। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে খুব সাবধানে পাথরের চাঁইতে পা রেখে রেখে জলের ধারে গিয়ে দুজনে জল খেলেন। জল খেতে গিয়েই নবতারণ হঠাৎ দেখতে পেলেন কাদায় মানুষ আর বাঘের পায়ের ছাপ! তিনি বোকা লোক নন। বুঝলেন, আশপাশেই আসামীদের ঠিকানা মিলবে। বাঘকে তাঁর বিশেষ ভয় নেই। সঙ্গে গুলিভরা দুটো রিভলভার আছে। আর আছে টর্চ।

নবতারণ ঘোড়ার পিঠে চেপে আস্তে-আস্তে চারদিকটা ঘুরে ঘুরে

দেখতে লাগলেন। এবং হঠাৎই তাঁর নজরে পড়ল, একটা জামগাছে ভাঙা মৌচাকের দগদগে দাগ। তাজা মধুর ফোঁটা পড়ে মাটি ভিজে আছে। মধুর ফোঁটার একটা লাইনও গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। মধুর চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলেন অসম-সাহসী নবতারণ। দু-একবার ভুল পথে গেলেও অবশেষে দেখতে পেলেন, একটা পুরনো ইঁদারার মধ্যে একটা লতা নামানো রয়েছে।

নবতারণ নিঃশব্দে ঘোড়া থেকে নামলেন। লতাটার জোর পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে পড়লেন ইঁদারার মধ্যে। টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গের মুখটা পেতেও তাঁর দেরি হল না।

সুড়ঙ্গে ঢুকে টর্চ ফেলে ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর মোটেই সময় লাগল না। লখনউয়ের ভুলভুলাইয়ায় তিনি বহুবার ঢুকেছেন। এ-সুড়ঙ্গ সে-তুলনায় ছেলেমানুষ।

মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যেই তিনি গুপ্ত কুঠুরির দরজায় পৌঁছে ভিতরে টর্চের আলো ফেললেন এবং রিভলভার তুলে ধরে বললেন, "মাধববাবু! বনমালী! হ্যাণ্ডস আপ!"

দুই ফেরারি আসামী হাত তুলে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল দেখে নবতারণ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। আমার ফোর্স জায়গাটা ঘিরে ওপরে অপেক্ষা করছে। খুব সাবধানে হাত তুলে বেরিয়ে আসুন।"

ঠিক এই সময়ে মাধবের নাক দিয়ে নন্দকিশোর উঁকি মারে, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এ যে একেবারে কেচ্ছা করলে হে মাধবচন্দ্র। তীরে এসে ভরাডুবি! তা ঐ ভিতুর ডিম দারোগাটাকে ভয় খাওয়ারই বা কী আছে? তুমি তো বাপু গায়েগতরে কিছু কম নও, লাফিয়ে পড়ে

জাপটে ধরে পেড়ে ফেল না!"

মাধব ভয়ে ভয়ে বললেন, "কিন্তু আমার যে দারোগা-পুলিসকে ভীষণ ভয়!"

বিজ্ঞের মতো নন্দকিশোর বলে, "ভয়টা কোনো কাজের কথাই নয়। তোমার সাহসের থলি আমি ফুলিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন যে ভয়টা পাচ্ছ সেটা আসল ভয় নয়, এ হল গিয়ে ভয়ের স্মৃতি।"

মাধব বললেন, "আজ্ঞে ঠিক ভয় নয় বটে। কিন্তু যেন সাহসও পাচ্ছি না। হাতে পিস্তল রয়েছে তো। তা আপনার গায়ে তো গুলি লাগে না শুনেছি, আপনিই কাজটা করে দিন না!"

একথায় রেগে গিয়ে নন্দকিশোর বলে, "সবই যদি আমি করে দেব তাহলে ভগবান তোমাকে হাত-পা-মগজ দিয়েছে কেন শুনি! আচ্ছা অপদার্থ তো! কতবার তো বলেছি, ভূতের ক্ষমতা সম্পর্কে যা শোনো তা সব গাঁজাখুরি গল্প।"

এইসব যখন হচ্ছে তখন বনমালী আর নবতারণ হাঁ করে মাধবকে দেখছে। নবতারণ বললেন, "মাধববাবু, আপনার নাক থেকে সাদা-মতো ওটা কী ঝুলে আছে? নাকের পোঁ নাকি?"

লজ্জিত হয়ে মাধব বললেন, "আজ্ঞে না। ইনি হলেন নন্দকিশোর মুনসি। অতি ভদ্র একজন ভূত। পাতুগড়ের আমবাগান থেকে আমার পিছু নিয়েছেন।"

"বলেন কী!" বলে চোখ কপালে তোলেন নবতারণ। নন্দ-কিশোরের পাল্লায় তিনিও পড়েছিলেন। ফলে নবতারণের গায়ে কাঁটা দিল এবং হাত-পা অবশ হয়ে পড়ল। রিভলভারটা ঠকঠক করে কাঁপছিল হাতে।

মাধব তাই এগিয়ে গিয়ে খুব স্নেহের সঙ্গে নবতারণের হাত

থেকে এবং খাপ থেকে ছুটো রিভলভারই নিয়ে নিলেন। পিস্তল মাধবের হাতে যেতেই নিয়মমভো নবতারণ ছুহাত ওপরে তুলে দিলেন। মাধব তাঁর হাত ধরে টেনে মেঝের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু বিশ্রাম করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বরং ওপরে আপনার ফোর্সকে খবর পাঠাচ্ছি।"

করুণ মুখ করে নবতারণ একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "ফোর্স নেই। মিথ্যে কথা বলেছিলুম।"

"তাহলে!" মাধব জিজ্ঞেস করলেন।

নবতারণ বললেন, "আমি সারেণ্ডার করছি। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন। আপনার স্ত্রী আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।"

পরদিন সন্ধেবেলা বিজয়পুরের জমিদারবাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। বাড়িভর্তি আত্মীয়-স্বজন। মেয়ে-জামাই ছেলেপুলে যে যেখানে ছিল সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছে। রায়বাহাছুরের ছোট মেয়ে আর একটু বাদেই বিষ খাবে। মেয়ের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে পড়ে আছেন মা, পিসি, মাসি, দাসীরা। রায়বাহাছুর নিজে বাইরের বারান্দায় খড়ম পায়ে পায়চারি করছেন। একটু আগেই মাধবের জন্য তিনি এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। উকিল, মোক্তার ডাক্তারে বাড়ি গিজ-গিজ করছে, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। বাইরের মস্ত আঙিনায় প্রজা এবং কর্মচারীরা জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই কাঁচুমাচু মুখ। খবর এসেছে, হেতমগড়ের জঙ্গলে নবতারণের পুলিস-বাহিনীর সবাই গায়েব হয়ে গেছে। কারও কোনো খোঁজ নেই।

পরশুদিন থেকে পায়চারি করতে করতে রায়বাহাছুর এ পর্যন্ত

বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ক্রোশ হেঁটে ফেলেছেন। এখন হাপসে পড়ে বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে হাঁক দিয়ে তামাক চাইলেন। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। অপদার্থ জামাইটার জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার খুবই বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাও সেই ব্যাটার টিকির নাগাল পাওয়া গেল না। জামাইটাকে হাতের কাছে পেলে এখন খড়মপেটা করবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। সেই সঙ্গে উজবুক নিষ্কর্মা নবতারণ দারোগাকেও দেশছাড়া করবেন। রাগে দুঃখে দাঁত কড়মড় করছিল তাঁর। তামাকের নলের মুখটা চিবিয়ে প্রায় ছিবড়ে করে ফেললেন। এখনো তাঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, এখনো তিনি হাঁক মারলে মাটি কেঁপে ওঠে, সেই তাঁকেই কিনা ঘোল খাওয়াচ্ছে অপোগণ্ড ভ্যাগাবণ্ড জামাই মাধব!

রাগের চোটে আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ খুব কাছেই বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হল, ভ্রাম! আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাঠে 'বাবা রে! মা রে!' বলে খুব একটা শোরগোল তুলে লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল আঙিনা।

রায়বাহাদুর একটু চমকে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভয় খাওয়ার বান্দা তিনি নন। বারান্দার দুধারে দুজন বন্দুকধারী দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন শব্দ শুনে মূর্ছা গেছে। তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে রায়বাহাদুর সিঁড়ির মাথায় বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন।

এইসময়ে ফটক পার হয়ে আঙিনায় একটা জংলি চেহারার লোক এসে ঢুকল। তার দু হাতে দু-দুটো বন্দুক, কাঁধে একটা মস্ত বাঁদর, পাশে একটা বিশাল চিতাবাঘ। লোকটার হাবভাব বেশ বেপরোয়া। গটগট করে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল,

"আমার স্ত্রীকে এক্ষুনি ফেরত চাই। সে যদি আত্মঘাতী হয়ে থাকে তবে এ-বাড়ির কাউকে জ্যান্ত রাখব না।"

রায়বাহাদুরের হাত-পা কাঁপছিল। বাঘটা তাঁর গা শুঁকছে। বাঁদরটা মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। বন্দুকটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল যখন দেখলেন, জামাইয়ের কানের লতি ধরে ঝুল খাচ্ছে বিঘতখানেক লম্বা সাদামতো একটা ভূত। রায়বাহাদুর হাতজোড় করে বললেন, "না, এখনো আত্মঘাতী হয়নি। এসো বাবাজীবন।"

বলা বাহুল্য, সেই রাতে শ্বশুরবাড়িতে আর মাধবকে কেউ স্থপুরি-ভরা নাড়ু দেওয়ার সাহস পেল না। তবে দিলে খুব একটা অসুবিধেও হত না। কারণ নন্দকিশোরের হাতের গুণে মাধবের দিব্যি কচি-কচি দাঁত গজিয়ে গেছে। খুবই শক্ত দাঁত, আর ভারী সুরসুর করে সবসময়ে। শক্ত কিছু চিবোতে ইচ্ছে করে।

পরদিন থেকেই হেতমগড়ের জঙ্গল হাসিল করে পুরনো বাড়ির জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলেন মাধব। অগাধ মোহর আর হীরে জহরত পেয়ে এখন তিনি এ-তল্লাটের সবচেয়ে বড়লোক। তাই বাড়ি তৈরি করেই ক্ষান্ত রইলেন না, মাধব। পুরনো হেতমগড় আবার গড়ে তুললেন। সড়ক বানালেন, পুকুর আর দিঘি কাটালেন, ইস্কুল-পাঠশালা খুলে দিলেন। হেতমগড় আবার জমজমাট হয়ে উঠল। হেতমগড়ের দারোগা হয়ে এলেন সেই দোর্দাণ্ডপ্রতাপ নবতারণই। বনমালীর স্যাঙাতরা চাষবাস করে খায়, বনমালী নিজে মাধবের বাগান তদারক করে। সেই চিতাবাঘ, ঘটোৎকচ আর নন্দকিশোরও মাধবের বাড়িতেই আছে। তাদের আর কেউ ভয় খায় না।

—



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহে। পিতার রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। কোচবিহারের ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ.। বি.এ. এবং স্নাতকোত্তর পাঠ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। এখন 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' শারদীয় 'দেশ'-এ প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যের জন্য ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। পরেও আরেকবার, 'দূরবীন'-এর জন্য। 'মানবজমিন' উপন্যাসে পেয়েছেন ১৯৮৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য এবং সহপ্রতিঋত্বিক।

....

প্রচ্ছদ মদন সরকার